প্রথম অধ্যায়

উৎপল দত্তের সমকালে রাজনৈতিক ভাঙাগড়ার ইতিবৃত্ত

বাংলা নাটকে যারা সাহসিকতার সঙ্গে রাজনীতিকে মঞ্চে নিয়ে এসেছেন এবং জনপ্রিয় করে তুলেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন উৎপল দত্ত। পুরো নাম উৎপলরঞ্জন দত্ত। নাটকের রাজনীতি নিয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে, সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে উৎপল দত্তের অবদান সবচেয়ে বেশি। অনেকেই রাজনৈতিক নাটক এবং উৎপল দত্তকে সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। বাংলা রাজনৈতিক নাটকের ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতা খুবই গৌরবজনক। আদিপর্বের বাংলা নাটকে যথা রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুল সর্বস্ব', দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ', মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', মীর মশারফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ' প্রভৃতি নাটকে সমাজ সংস্কার ও সমাজ চেতনা এবং ইউরোপীয় বিশেষ করে ব্রিটিশ বণিকদের নির্মম শোষণের চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সমসাময়িক সমাজের অর্থ-রাজনৈতিক কার্যকলাপ এবং তার প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, বিরুদ্ধাচরণ এই নাটকগুলোকে রাজনৈতিক নাটকে পরিণত করেছে। তারপর জাতীয়তাবাদের উন্মেষ পর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র দত্ত, হরলাল রায় প্রমুখ নাট্যকার মূলত ইতিহাসের প্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নাটক রচনা করেছিলেন। এর পরবর্তীকালে এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চল্লিশের দশকে ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন ও গণনাট্য আন্দোলন, নাট্য রাজনীতির মধ্য দিয়ে উৎপল দত্ত নাটকে রাজনীতির এই ধারাকে ঐতিহ্যের সঙ্গে বহন করে চলেছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল পর্যন্ত যারা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নাটক লিখেছেন এবং মঞ্চস্থ করেছেন তাঁদের নাটককে সমগ্রভাবে দেখলে বোঝা যাবে যে, শুধুমাত্র রাজনীতি তাদের সমগ্র নাটকের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক ছিল না, সহজ সরলভাবে বলতে গেলে বলা যায় তারা অন্য অনেক বিষয়ের সঙ্গে রাজনীতিকে বিষয় হিসেবে নাটকে এনেছেন। এই নাট্যকারগণ তাঁদের সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলিকে সোজাসুজি নাটকে উপস্থাপিত না করে বিভিন্ন সামাজিক ও ঐতিহাসিক বাতাবরণে তা উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু উৎপল দত্ত সরাসরি আর দশটা নাটকের সঙ্গে সঙ্গে কিছু রাজনৈতিক নাটক লিখেছেন। রাজনৈতিক ঘটনাকে সরাসরি নাটকে এনেছেন। এখানেই পূর্বসূরিদের থেকে উৎপল দত্ত একেবারে স্বতন্ত্র। উৎপল দত্ত একান্তভাবেই সাম্রাজ্যবাদ,

ফ্যাসিবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ-এর বিরোধী এক বিশিষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির নাট্যকার ছিলেন। এই সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ ও শোষণবাদের বিরুদ্ধে তাঁর কলম গর্জে উঠেছে সদাসর্বদা।

উৎপল দত্তের নাটক ফ্যাসিবাদ বিরোধী দর্শন কীভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে তা অনুধাবন করতে গেলে ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে ও ফ্যাসিবাদের চরিত্র সম্পর্কে সম্যক পরিচয় প্রয়োজন। ফ্যাসিবাদের উদ্ভব রোমে। রাষ্ট্রীয় শাসন কর্তৃত্ব ও চরিতার্থ করার মধ্য দিয়েই ফ্যাসিবাদের উৎপত্তি হয়। ফ্যাসিবাদী আদর্শ ও ফ্যাসিবাদী দর্শন মানুষ ও প্রকৃতি সম্পর্কে কতকগুলো চরম নিয়মের কথা বলে, যার বিরুদ্ধে কোনো প্রশ্ন করা যায় না, যার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করা যায় না, যার বিরুদ্ধে বাক্‌স্বাধীনতাটুকুও হরণ করা হয় সেই হল ফ্যাসিবাদ। মৌলবাদী একটি মতাদর্শ ও বিশ্বাসকে এই দর্শন প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সর্বোপরি কিছু মিথ্যা প্রচারের মধ্য দিয়ে এই দর্শন কৌশলের সঙ্গে জনসাধারণের চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করে এবং আধিপত্য বিস্তার করে। ফ্যাসিবাদ জাতি গঠনের ক্ষেত্রে রক্তের বিশুদ্ধতা এবং জাতিসত্তাগত পবিত্রতাকে অপরিহার্য মনে করে। এই রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য ফ্যাসিবাদ অন্য জাতির প্রতি আক্রমণকেই প্রধান পন্থা বলে মনে করে। ফ্যাসিবাদ নেতিবাচক সমষ্টিবাদের ওপর গুরুত্ব দিয়ে গণতন্ত্রকে বিনষ্ট করতে চায়। তার জন্য ফ্যাসিবাদের প্রয়োজন হয় আধিপত্যকামী কর্তৃত্বকারী একটি রাষ্ট্রের। ফ্যাসিবাদ, উদারনীতিবাদ এবং মুক্ত অর্থনীতি ভাবাদর্শের বিরোধিতা যেমন করে তেমনি সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রবল পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত সমাজতন্ত্রকে প্রধান শত্রু হিসেবে গণ্য করে। উৎপল দত্ত সারাজীবন ধরে এই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধ করেছেন, এই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তাঁর কলম সচল থেকেছে সদাসর্বদা, জীবনের আদ্যপ্রান্ত ফ্যাসিবাদ বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তাঁর লেখায়। সুতরাং খুব স্বাভাবিকভাবে উৎপল দত্তের নাটকে ফ্যাসিবাদ বিরোধী, কর্তৃত্ববাদ বিরোধী এক দর্শন প্রকাশ পেয়েছে। এই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ প্রতিরোধ তিনি তুলে ধরেছেন নাটকের বিভিন্ন আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে। ফ্যাসিবাদী অত্যাচার, শোষণ-নিপীড়ন-এর সাক্ষী হল আমাদের অতীত ইতিহাস। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে উৎপল দত্ত তাঁর নাটকে চয়ন করে তিনি ফ্যাসিবাদী অত্যাচার শোষণ নিপীড়নকে যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি তার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ প্রতিরোধী কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছে তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে।

উৎপল দত্ত বিশ্বাস করতেন বিশ্বের সব দেশেই শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শাসকশ্রেণি দ্বারা শোষিত মানুষের ওপরে দমন-পীড়ন অত্যাচার ও নিপীড়ন শাশ্বত চিরন্তন। উৎপল দত্ত মনে করেন বিশ্বের সব দেশের মতোই ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস ও শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস, অনবরত রক্তক্ষয়-যুদ্ধের ইতিহাস, যুগে যুগে শাসকের অত্যাচার ও শোষিতের প্রতিরোধে তাদের

আর্তনাদের ইতিহাস। উৎপল দত্ত লক্ষ করেন এই বাস্তব রাজনৈতিক ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে শাসক শ্রেণির কিছু রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রচিত বিকৃত ইতিহাস পাঠের মধ্য দিয়ে। ভারতের স্বাধীনতা এসেছে শান্তিপূর্ণ পথে— এই তত্ত্বের স্পষ্ট বিরোধিতা করেন উৎপল দত্ত এবং তিনি স্পষ্ট ভাষায় তার প্রতিবাদ করেন। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশের জনগণ বারবার যে সশস্ত্র আন্দোলন করেছেন, স্বাধীনতার জন্য অসংখ্য মানুষ আত্ম বলিদান দিয়েছেন সেসব নজির ইতিহাস থেকে বেমালুম ছাঁটাই হয়ে যাচ্ছে কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তির স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য, উৎপল দত্ত তার প্রতিবাদ করেন। তাই তিনি মনে করেন ভারতবর্ষের মানুষকে জানাতে হবে তাদের প্রকৃত ইতিহাস, তাদের রাজনৈতিক ইতিহাস। শোষিত মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে তাদের সংগ্রামী ঐতিহ্য।

উৎপল দত্ত তার সমসাময়িক ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের ভাঙাগড়া— সেগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাঁর শিল্প কর্মের মধ্যে তুলে ধরেছেন। শুধুমাত্র ভারতবর্ষ নয় বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক যে উত্থানপতন, যেগুলো তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে এড়িয়ে যায়নি। সেগুলোকেও তার শিল্পকর্মে স্থান দিয়েছেন, বিশেষত প্রতিটি সাম্রাজ্য বিরোধী লড়াইকে তিনি তাঁর নাট্যকর্মে স্থান দিয়েছেন। শুধুমাত্র সমসাময়িক বাংলার রাজনৈতিক ঘটনাবলি নয়, ভারতবর্ষের তথা বিশ্বের ঘটনাবলি, যা ভারত তথা বিশ্বের রাজনীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, আন্দোলিত করেছিল সেগুলি নিয়েও তিনি নাটক রচনা করেছেন। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ, সিরাজ-উদ্‌দৌলা, মীর কাশিম, তিতুমীর, সিধু কানু, ঝাঁসির রানি, সূর্যসেন, ক্ষুদিরাম, মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা প্রভৃতি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বা এইসব বিপ্লবীদের কথা; আবার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, নৌ বিদ্রোহ, তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ, চটকল ও সকল শ্রমিকদের সংগ্রামের কথা প্রভৃতি তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন এবং তাঁর শিল্পকর্মে স্থান দিয়েছেন। উৎপল দত্তের কথায়—

> *সময় এসেছে এ প্রদেশের প্রতি কোনায় সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের কাহিনী পৌঁছে দেওয়ার, সেই সিরাজ, মীরকাশেম, মজনু শাহ থেকে ডিরোজিও, তিতুমীর, সিধু কানু, মেঘাই সর্দার, কুঁয়ার সিং, ঝাঁসির রানী, আজিমুল্লাহ, নানা সাহেবের পথ ধরে ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, সূর্যসেন, গণেশ ঘোষ হয়ে মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা নতুন ধরনের বিপ্লবীদের কথা পর্যন্ত। সুভাষ, আই এন এ, নৌ বিদ্রোহ, তেলেঙ্গানা, চটকল আর সুতা কলের শ্রমিকদের সংগ্রাম— এসব হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের পূর্বসূরীদের প্রচণ্ড আপোষহীন লড়াইয়ের একটি অধ্যায়।*[১]

বিদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রতি তাঁর দৃষ্টি সমানভাবে নিক্ষেপ ছিল। বিশ্বের ইতিহাস যখন কলঙ্কিত হয়েছে, যখন সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, যখন শ্রমিক কৃষক শ্রেণির স্বার্থ

বিঘ্নিত হয়েছে তখন সেসব ঘটনা অবলম্বন করে উৎপল দত্তের কলম গর্জে উঠেছে। সোভিয়েত রাশিয়ার মুক্তি সংগ্রাম, রুশবিপ্লবের নায়ক লেনিন, তার কর্ম চিন্তা ও তার বিপ্লবের আহ্বান, অক্টোবর বিপ্লবের আদি ও উত্তরকাল অথবা বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত রাশিয়ার গঠন প্রক্রিয়া এবং স্তালিনের কর্মপন্থার বিশ্লেষণ প্রভৃতি ঘটনাবলি তাঁর নাট্য বিষয়বস্তু হিসেবে তিনি চয়ন করেছেন। ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনতার বিপ্লব আন্দোলন এবং তাদের ভূমিকা, অন্যদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কিউবার জনগণের মুক্তির লড়াই প্রভৃতি ঘটনাবলি তাঁর দৃষ্টির অগোচরে ছিল না। জার্মানিতে ফ্যাসিস্ট অত্যাচার, ইহুদি ও কমিউনিস্ট নিধন ও বিজ্ঞানীদের ওপর নাৎসিদের অত্যাচার, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের সৈন্য ও জনগণের আমৃত্যু মরণপণ প্রতিরোধ ও মুক্তির লড়াইকে তিনি কুর্নিশ জানিয়েছেন এবং শিল্পকর্মে স্থান দিয়েছেন। আবার অন্যদিকে আমাদের পূর্ববঙ্গে মানুষের ওপরে পাকিস্তানি সেনাদের অকথ্য অত্যাচার ও তাদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের কাহিনি অর্থাৎ ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের লড়াই প্রভৃতি রাজনৈতিক ঘটনাবলি যেসব ভারত তথা বিশ্বের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছিল, সেই ঘটনাবলি তিনি তার নাট্যকর্মে নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন প্রতিবাদ প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে।

শুধুমাত্র ভারতবর্ষের এবং পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলি নয়, তাঁর তীক্ষ্ম দৃষ্টি ভারতবর্ষের সমসাময়িক ঘটনাবলি যা ভারতবর্ষের রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছিল সেসব ঘটনাবলিকে কেন্দ্র করেও তিনি লিখে গেছেন কালজয়ী নাটক। বিহারের জামাডোবায় চিনাকুরি কয়লাখনির যে দুর্ঘটনা এবং শ্রমিকদের অসহায় মৃত্যু, দাড়ি কয়লা খনির শ্রমিকদের ওপরে মালিক পক্ষের যে নির্মম শোষণ অত্যাচারের কাহিনিকেও তিনি তুলে ধরেছেন। ১৯৭৫-এর ভারতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা, তার স্বরূপ ও প্রতিক্রিয়া, সাধারণ মানুষের ওপরে অত্যাচার, প্রতিবাদী কণ্ঠকে দমিয়ে রাখার অপচেষ্টা এবং তার বিরুদ্ধে নতুন জীবনের স্বপ্ন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা; আবার ১৯৭০-এর দশকে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস দমন-পীড়ন, সাধারণ মানুষের কথা বলার অধিকার হরণ, এই অন্ধকার দিনগুলো আবার ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে চিন ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ, কমিউনিস্ট শিবিরে ভাঙন, নকশাল আন্দোলন প্রভৃতি ঘটনাবলিকে কেন্দ্র করে তিনি রচনা করেছেন ও মঞ্চস্থ করে গেছেন কালজয়ী সব নাটক, যা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের রাজনীতিতে এক বিশেষ ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

উৎপল দত্তের সমকালে রাজনৈতিক ভাঙাগড়ার ইতিবৃত্ত

সাহিত্যের জন্ম হয় যুগপৎ সময় ও সমাজের করতলে। সময় ও সমাজের প্রভাব সাহিত্যের

অন্যান্য অঙ্গের উপরে যেমন বিশেষভাবে দৃশ্যমান হয়, নাটকের ক্ষেত্রেও তেমনি। বিষয় নির্বাচন, চরিত্র চিত্রন, বিষয় বিন্যাস, চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংযোগে প্রবহমান কালের বিশেষ ছাপ পরিলক্ষিত হয়। সময়ের সুস্পষ্ট প্রভাব সাহিত্যের উপর যেমন আরোপিত পাশাপাশি সাহিত্যিক তথা নাট্যকারদের উপরেও সমানভাবে ছাপ ফেলতে সক্ষম। সময়, সমাজ, রাজনীতির নানামুখী প্রসারের পট পরিবর্তন কীভাবে নাট্যকার ও নাট্যসাহিত্যে তথা নাট্যকার উৎপল দত্তের উপরে কতটা কতভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল তা বিচার বিশ্লেষণ ও বুঝে নেওয়ার অভিপ্রায়ে আমাদের বর্তমান সমীক্ষণ। এই অভিপ্রায়ে আমরা উৎপল দত্তের সমকালে বিভিন্ন রাজনৈতিক ভাঙাগড়ার, রাজনৈতিক আন্দোলন প্রভৃতি আলোচনায় প্রয়াসী হব, যাতে বুঝে নেওয়া সম্ভব হয় উৎপল দত্তের নাটক ও তাঁর জীবনে তৎকালীন রাজনীতি কতখানি ছাপ ফেলেছিল ও প্রভাবিত করেছিল। উৎপল দত্তের জন্ম ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ২৯শে মার্চ এবং তিনি পরলোক গমন করেন ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে ১৯শে আগষ্ট। আমরা আলোচনার সুবিধার্থে বিশ শতকের রাজনীতির ভাঙাগড়ার ইতিবৃত্ত নিয়েই আলোচনায় অগ্রসর হব।

* ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর ভারতের ভাইসরয় লর্ড কার্জনের আদেশে বঙ্গভঙ্গ সম্পন্ন হয়। ইংরেজরা তাদের শাসন কায়েম রাখার উদ্দেশ্যে এক নোংরা হীন চক্রান্ত করে বাংলাকে ভেঙে টুকরো করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বাংলা ছিল সেই সময় সমস্ত স্বাধীনতা আন্দোলন ও বিদ্রোহের উৎসস্থল। তাই ইংরেজরা তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়া বিভিন্ন বিদ্রোহ ও আন্দোলনকে অবদমিত করার উদ্দেশ্যে বাংলাকে ভেঙে টুকরো করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর প্রতিবাদে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বশরীরে পথে নামেন ও বাঙালিকে দ্বিখন্ডিত করার ঘৃণ্য চক্রান্তকে রুখে দেওয়ার উদ্দেশ্যে হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান সকলের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষার জন্য রাখি বন্ধন উৎসব শুরু করেন।

* ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় মুসলিমদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়।

* ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় ঘটে যায় এক স্মরণীয় ঘটনা। মজফরপুরে কলকাতা প্রেসিডেন্সীর অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করার সংকল্প গ্রহণ করে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী। বোমা নিক্ষেপ করে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তারা মজফরপুরের মতিঝিলে উপস্থিত হয় ও ম্যাজিট্রেট কিংসফোর্ডের গাড়িকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করে। যে ঘটনা বাংলা বিপ্লবী আন্দোলনকে আরও উজ্জীবিত ও উদ্বুদ্ধ করে। পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আগেই আত্মঘাতী হন প্রফুল্ল চাকী এবং বিচারে ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসী হয়। দেশমাতৃকার জন্য নিবেদিত প্রাণ ক্ষুদিরাম বসুর হাসি

মুখে ফাঁসির দড়িকে গলায় পরার বৃত্তান্ত আজও বাঙালির অন্তরে জাগ্রত।

* ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয় মর্লে-মিন্টো আইন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বকে খুশি করে ও জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে ভারতসচীব জন মরলি বড়লাট লর্ড মিন্টো একটি শাসন সংস্কারের পরিকল্পনা করেন ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে। এই শাসন সংস্কার মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন নামে পরিচিত। একাধিক ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও এই আইনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম, বিশেষত ভারতের জাতীয় আন্দোলন সংগ্রাম ও বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে। ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতির উপরে এর গভীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

* ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় সাহিত্য সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার জয়। আবার, এই একই বছরে ভারতীয় উদারবাদের নীতি অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হয় গদর পার্টি। গদর পার্টি বলতে মূলত বোঝায় ভারতীয় বা ভারতবাসীর দ্বারা গড়ে ওঠা বিপ্লবী সংগঠন। যার উদ্দেশ্য ছিল উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া অর্থাৎ উপনিবেশ বাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো।

* ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে সংগঠিত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এই বিশ্বযুদ্ধের সর্বাত্মক প্রভাব সমস্ত বিশ্বব্যাপী যেমন পড়েছিল, সেই সাথে সাথে পরীধীন ভারতবর্ষের রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতির উপরে ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

* ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে সংগঠিত হয় চম্পারণ বিদ্রোহ। ভারতের শ্রমজীবি, ভূমিদাস, খেটে খাওয়া মানুষদের আমরণ সংগ্রামের কাহিনি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার দশ হাজারের বেশি চম্পারণের চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক ভূমিদাসদের নীল চাষ করতে বাধ্য করে। এবং সেই নীল খুব কম দামে চাষীদের কাছ থেকে কিনে চাষীদের সাথে প্রতারণা করে তা রপ্তানী করত। তার প্রতিবাদে মূলত এই চম্পারন বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে এই সময় রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল লেনিনের নেতৃত্বে, যা সারা বিশ্ব ব্যাপী মার্কসবাদী সংগঠন ও আন্দোলনকে এক বিশেষ মাত্রা প্রদানে সক্ষম হয়।

* ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে রাউলাট অ্যাক্ট আইন প্রণয়ন হয়, যাকে বলা হয় 'কালা কানুন'। এই আইনের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তার শাসন শোষণের দূড়ান্ত নগ্ন রূপ উদ্‌ঘাটিত করেছিল। অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রকোপে যেমন নাট্যশালায় ব্রিটিশ বিরোধী কোনোরকম কথাবার্তা বা ব্রিটিশ বিরোধী কোনোরকম ঘটনা দেখানো যেত না, তেমনি এই 'কালা কানুন' এর প্রবর্তনে শুরু

হল অকথ্য নির্যাতন, সভা সমাবেশ বন্ধ, বিনা বিচারে আটক ও জেলের মধ্যে গুলি করে হত্যা। ব্রিটিশ শাসনের এই পৈশাচিক রূপ ও কালো অধ্যায় ভারতবাসীকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দেই পাঞ্জাবের অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে ঘটে নৃশংস হত্যাকান্ড। যাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যন্ত ব্যাথিত হয়ে তাঁর নাইট উপাধি ত্যাগ করেন।

* ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে গান্ধিজীর নেতৃত্বে শুরু হয় 'আইন অমান্য আন্দোলন'। ব্রিটিশ শাসন ও শোষনের বিরুদ্ধে জনগণের এক স্বত:স্ফুর্ত বিদ্রোহী আন্দোলন।

* ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ঘটে চৌরিচৌরা ঘটনা। যেখানে ব্রিটিশ শাসন শোষণের বিরুদ্ধে জনতা কৃষক মজুরের স্বতঃস্ফূর্ত সশস্ত্র প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে শামিল হয়েছিল।

* ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে সাইমন কমিশনের ভারতে আগমন ঘটে, পাশাপাশি দেশজুড়ে বয়কট আন্দোলন প্রকট হয়ে দেখা দেয়।

* ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আইন অমান্য আন্দোলন শুরু, মহাত্মা গান্ধীর ডান্ডি অভিযান। আবার প্রথম গোল টেবিল কনফারেন্স হয় এই খ্রিস্টাব্দেই। এই সময় পূর্ব বঙ্গের বিপ্লবী আন্দোলন অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে সূর্য সেনের নেতৃত্বে। পঁয়ষট্টিজন বিপ্লবী চট্টোগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও বন্দুকের লড়াইয়ে আশি জন রক্ষী ও বারো জন বিপ্লবীর মৃত্যু, সূর্য সেন সহ বহু বিপ্লবী পলাতক যদিও পরে অনেকেই ধরা পড়েন। অন্যদিকে বিনয়-বাদল-দিনেশের রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ, আইজি সিমসন-কে হত্যা করার মত ঘটনা ঘটাতে সক্ষম হয়। ধরা পড়ে বাদল বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হন। বিনয় ও দিনেশ নিজেদের গুলি করে, পাঁচদিন পরে বিনয়ের মৃত্যু হয় ও দিনেশ সুস্থ হয়ে ওঠে, যদিও পরবর্তীকালে বিচারে তাঁর ফাঁসী হয়।

* ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে গান্ধী আরউইন চুক্তি সম্পন্ন হয়। অন্যদিকে লাহোড় ষড়যন্ত্র মামলায় ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর ফাঁসি কার্যকর হয়। সাথে সাথে পূর্ববঙ্গের বিপ্লবী আন্দোলন ক্রমাগত মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠতে থাকে।

* ১৯৩২ গান্ধীজির হাজতবাস হয় ও কংগ্রেসকে নিষিদ্ধ করা হয়। চট্টোগ্রাম মামলার রায়ে বারো জনের যাবজ্জীবন সাজা প্রাপ্ত হয়।

* ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে চট্টোগ্রামের বিপ্লবী নেতা মাস্টারদা সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তীদারের ফাঁসীর নির্দেশ কার্যকর করা হয়, যা বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনকে আরও উত্তেজিত ও উদ্দীপিত করে তুলেছিল।

* ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ব্রিটিশ রাজশক্তি এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল সরাসরি। তিরিশের দশক থেকেই জার্মানি, ইটালি, স্পেন, জাপানে ফ্যাসিস্ট শক্তি মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছিল। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এক নির্লজ্জ প্রচেষ্টা চলছিল যার ফলে সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষের স্বাধীনতা ও সত্তা বিনষ্ট করে দিচ্ছিল। হিটলার ও মুসোলিনির দ্বৈত আস্ফালনে সমগ্র ইউরোপ জুড়ে গণতন্ত্র ভুলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। এই পরিবেশ পরিস্থিতিতে গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষদের স্বাধীনতা যেমন নষ্ট হচ্ছিল তেমনি শিল্পসাহিত্যের স্বাধীন সত্তা ও স্ফুর্তি লাভ করতে পারছিল না। তাই গণতন্ত্রকে বাঁচাবার জন্য ও শিল্পসাহিত্যকে রক্ষা করার তাগিদে গণিতান্ত্রিক মানুষেরা একত্রিত হতে থাকলেন।

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু নানারকম মতপার্থক্যের কারনে কংগ্রেসের সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্ক ত্যাগ করেন ও নিজস্ব মতাদর্শ ও ভাবনা চিন্তায় গঠন করেন ফরওয়ার্ড ব্লক।

* ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগ লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব পেশ করে।

* ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে বহু প্রস্তাব নিয়ে ক্রিপস মিশনের ভারতে আগমন ঘটে। এই সময় ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হয়ও তার সর্বাত্মক ব্যাপকতা লাভ করে। সুভাষ চন্দ্র বোসের নেতৃত্বে গঠিত হয় আজাদ হিন্দ বাহিনী, যা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশেষ কার্যকরী ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ভারত ছাড়ো আন্দোলন এতটাই ব্যাপক ও তীব্র হয়ে উঠেছিল যে ব্রিটিশ সরকার তা দমন করতে চরম পন্থা অবলম্বন করে এবং তা দমন-পীড়ন-অত্যাচার-নৃশংসতার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। সরকারি হিসাব অনুসারে ১৯শে আগষ্ট থেকে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যেই ৬২২২৯ জনকে গ্রেফতার করা হয় ভারত রক্ষা আইনে। ১৮০০০ জনকে নজর বন্দি করে রাখা হয়। পুলিশ মিলিটারির আক্রমণ, অত্যাচার, নিপীড়ন ও নির্যাতনে নিহত হন ৯৪০ জন এবং আহত হন ১৬৩০ জন।

* ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে, বাংলা ১৩৫০ সাল অবিভক্ত বাংলায় দেখা যায় মহামন্বন্তর। যা বাংলার ইতিহাসে পঞ্চাশের মন্বন্তর নামে পরিচিত। সেই সাথে ভয়াবহ মহামারি-মড়ক এবং ঝড়, বৃষ্টি সহ নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্ষুধা-যাতনা ও ক্ষুধা-পীড়িত মানুষের আর্তনাদ, লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু। রেশনের দোকানে লম্বা লাইন, লঙ্গর খানার ভিড়, সুযোগ বুঝে মহাজন-মজুতদার, কালোবাজারিদের নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রবণতা। বিশ্বযুদ্ধের সাইরেন, সৈন্য মিছিল, ব্লাক আউটের মহড়া সেই সাথে ব্রিটিশ প্রশাসন ও পুলিশের অত্যাচার বাংলা তথা ভারতবর্ষের মানুষকে এক দু:স্বপ্নের অতলে প্রবেশ করতে বাধ্য করেছিল। এই কালা কালে কবি সুকান্ত

ভট্টাচার্য্যের ‘রবীন্দ্রনাথের প্রতি’ কবিতাটির কয়েকটি পঙ্‌ক্তি বিশেষ তাৎপর্য ও অর্থবহ—

“আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়
আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়।”[২]

১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সিঙ্গাপুরে আর্জি হুকুমৎ-ই আজাদ হিন্দ অর্থাৎ স্বাধীন ভারতে অস্থায়ী সরকার গড়ার কথা ঘোষণা করেন। যা আজাদ হিন্দ সরকার নামে পরিচিত। ব্রিটিশ সরকারকে অস্বীকার ও ভারত সরকারের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর এই মহৎ উদ্যোগ।

*১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা আন্দোলন তথা ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে সংগঠিত হয় নৌবিদ্রোহ যার তীব্রতা ও ব্যাপকতা সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। কেন্দ্রে গঠিত হয় অন্তবর্তীকালীন সরকার। পাশাপাশি কলকাতায় শুরু হয় হিন্দু মুসলিমের এক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা। সেই দাঙ্গা ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ে ঢাকা, নোয়াখালি এবং বিহারেও।

*১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ভাইসরয় হলেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট এল কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। ভারত ও পাকিস্তান ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে গেল দুটি দেশ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী হলেন পন্ডিত জওহরলাল নেহরু ও পাকিস্তানের মহম্মদ আলি জিন্না। ভারতবর্ষ উপভোগ করল স্বাধীনতার নতুন সূর্যের স্বাদ।

*১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ৩০শে জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করা হয় দিল্লীর সুবৃহৎ প্রাসাদ বিড়লা হাউসের প্রাঙ্গনে। তাঁর ঘাতক ছিলেন নাথুরাম গডসে। মহাত্মা গান্ধী হত্যার পিছনে ছিল এক সুবৃহৎ চক্রান্ত, এবং সেই চক্রান্তের পিছনে ছিল কিছু স্বার্থপর ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক নেতারা।

*১৯৫২-৫৩-র মধ্যে ভারতবর্ষের প্রথম সাধারণ নির্বাচন সংগঠিত হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নির্বাচনে ৪৮৯ টি আসনের মধ্যে ৩৬৪ টি আসন লাভ করে সরকার গঠন করেছিল।

*১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ভারত-চীন যুদ্ধ, ভারতের পরাজয়, যা ভারতের রাজনীতির উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে ও রাজনৈতিক নানান পট পরিবর্তন করে। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রাককালে দেখা যায় বিভিন্ন কলকারখানায় শ্রমিক আন্দোলন ও তাদের

দাবি দাওয়া নিয়ে ধর্মঘট যা তীব্র ও ব্যাপকতা লাভ করে। হুগলি জেলার হিন্দুমোটর কারখানায় ৬০০০ শ্রমিক বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে তাদের ধর্মঘট ও ধর্মঘটিদের উপরে মালিক পক্ষের নির্মম অত্যাচার ও দমন পীড়ন করে সে ধর্মঘট ও আন্দোলন অবদমিত করা হয়।

*১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধানচন্দ্র রায়-এর মৃত্যু, তাঁর জায়গায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হন খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন। এইসময় পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যসংকট ভয়াবহ রূপ ধারন করতে থাকে।

*১৯৬৫-৬৬ খ্রিস্টাব্দে খাদ্য সংকট এক চরম পরিণতি লাভ করে। ভয়ংকরতম খাদ্য সংকটের দিনে সারা দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু হয়, পুলিশের গুলি চলে, আন্দোলনকারীর মৃত্যু হয় ও সারা দেশব্যাপী হৈ চৈ পড়ে যায়।

*১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে আবার সাধারণ নির্বাচন সংগঠিত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসি অপশাসনের বিরুদ্ধে মুক্ত হওয়ার আশায় মেহনতি জনতা-মজদুর, শ্রমিক ও মধ্যবিত্তের লড়াই তীব্র হয়ে ওঠে। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হয় ও পশ্চিমবঙ্গের শাসনক্ষমতায় আসীন হয় কংগ্রেস বিরোধী দল ও বামপন্থী রাজনৈতিক দলের জোট 'যুক্তফ্রন্ট'। এই একই সময়ে মে মাসে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি অঞ্চলে শুরু হয় কৃষক শ্রেণির সশস্ত্র আন্দোলন। আদিবাসী, ক্ষেতমজুর, কৃষকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে নিহত হয় দুই শিশুসহ সাত কৃষক রমণী।

*১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে সন্ত্রাস ও অত্যাচারের মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আবার ক্ষমতা দখল করে কংগ্রেস দল। এ সময় পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে হানাহানি, মারামারি ও গুপ্তহত্যা ব্যাপক আকার ধারণ করে।

*১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে সারা দেশব্যাপী ঘোষিত হয় ইমারজেন্সী বা জরুরী অবস্থা। জরুরী অবস্থার পটভূমিকায় বিরোধীদের নির্বিচারে হত্যা, নির্যাতন, ঘরছাড়া, জেল বন্দি ও বিনা বিচারে আটক চলতে থাকত।

*১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হল। কংগ্রেসকে পরাজিত করে জ্যোতিবসুর নেতৃত্বে শাসন ক্ষমতায় এল বামফ্রন্ট সরকার, শুরু হল নতুনতর অধ্যায়।

উৎপল দত্ত ভারতবর্ষ তথা বিশ্বে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাবলি অতীব সুন্দর শিল্পসুষমায় তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ, চিন্তা ও চেতনা নাটকের মধ্যে তুলে ধরেছেন। মানুষের পাশে মানুষের কাছে থেকে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে রাজনীতি করে গিয়েছেন আজীবন। তাঁর স্পষ্ট

মত—"রাজনীতিভীতি– ও হল গণতন্ত্র নিধনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।..... তার পাশে প্রত্যক্ষ রাজনীতির কথাগুলি কি প্রত্যক্ষভাবে বলার প্রয়োজন নেই? রাজনীতির আসরটাকে গুণ্ডাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমরা সরে পড়ব নাকি?"[৩]

রাজনৈতিক ভাঙাগড়ার ইতিবৃত্তে উৎপল দত্তের মৌলিক নাটক

এবারে আমরা দেখার চেষ্টা করব উৎপল দত্ত তাঁর সমসাময়িক তথা বাংলা ও ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বিভিন্ন ঘটনাবলি নাট্যকর্মের বিষয় করে তুলেছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের প্রতিটি অধ্যায়কেই তাঁর শিল্পকর্মে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছিলেন। উৎপল দত্তের মনোজগতে এ চিন্তাধারা দানা বাঁধছিল ষাটের দশকের প্রথম থেকেই। সেই সময় থেকেই তিনি ভারতের ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়ন ও ইতিহাসের মধ্যে অন্তর গহনে ব্রতী হন।

হাতের কাছে তখন বড়ো ঘটনা বিহারের ধানবাদ অঞ্চলে সদ্য ঘটে যাওয়া জামা ডোবায় চিনাকুরি ও বড়াধেমো কয়লাখনি দুর্ঘটনা। সেখানে আগুন লাগা ও জল ঢুকে যাওয়ায় শ্রমিকদের মর্মান্তিক অবস্থার খবর তখন কলকাতার সংবাদপত্রের শিরোনামে। শ্রমিকদের প্রতি মালিকদের উদাসীনতা ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে তোলপাড় করে দিয়েছিল। উৎপল দত্ত নিজে এবং তাঁর নাটক প্রযোজনায় সাহায্যকারী অন্য কয়েকজনকে নিয়ে সেখানে গেলেন, তিনি নিজে সদলবলে সেখানকার পরিস্থিতি ঘুরে দেখলেন, দেখলেন শ্রমিকদের কষ্টকর জীবন, তাদের বস্তিতে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিশলেন, কথা বললেন। দুর্ঘটনার পর যেসব শ্রমিক খাদান থেকে বেঁচে ফিরেছিলেন তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন। সবকিছু জেনে বুঝে নিয়ে তারা ফিরে এলেন কলকাতায়। এবারে উৎপল দত্ত লিখলেন 'অঙ্গার' নাটক এই ঘটনা অবলম্বন করে। "প্রথমে নাম রাখা হয় 'কালো হিরে'। পরে লিটল থিয়েটার গ্রুপের তদানীন্তন সভাপতি চিত্ত চৌধুরির মতে নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'অঙ্গার'।"[৪]

১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে তিনি লিখলেন 'ফেরারী ফৌজ'। 'ফেরারী ফৌজ' নাটক রচনায় উৎপল দত্ত নতুন বিষয় চয়ন করলেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের পটভূমিতে এই নাটকটি লেখা। এই সময় পূর্ব বাংলার জেগে ওঠা যুবকদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ নিয়ে নাটকটি গড়ে উঠেছে। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন তখন তুঙ্গে। পূর্ব বাংলার যে বিপ্লবীরা সশস্ত্র আন্দোলনের পথ ধরে ছিল তাদের নিয়েই নাটক। ব্রিটিশ শাসনাধীন অবিভক্ত বাংলার এইসব বিপ্লবীদের কার্যকলাপ ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যবাদী যে শাসনব্যবস্থা তাকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এই ঘটনা শুধু বাংলার রাজনীতিতে নয় সারা ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষ ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছিল। উৎপল দত্ত সেই বিপ্লবী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বিপ্লবের ছবি ফুটিয়ে তুললেন আলোচ্য নাটকে।

'ফেরারী ফৌজ' নাটকের পরে উৎপল দত্তের আরেকটি ঐতিহাসিক প্রযোজনা 'কল্লোল' নাটক। মিনার্ভায় প্রথম অভিনীত হল ২৮ মার্চ, ১৯৬৫। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র বিদ্রোহকে বিষয়বস্তু করে এই নাটকটি লেখা হয়। এই নাটক বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা, কী বিষয় বস্তুর ক্ষেত্রে, কী আঙ্গিকের ক্ষেত্রে, কী সামাজিক আলোড়ন সৃষ্টির ক্ষেত্রে।

১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের ব্যর্থ ও অসম্পূর্ণ নৌ-বিদ্রোহের পর আবার পুনরায় নৌ-বিদ্রোহ সংঘটিত হলে ১৯৪৬ সালে সেনাবাহিনীর মধ্যে ব্রিটিশ শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে- এতদিনের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ ১৯৪৬ সালের নৌ-বিদ্রোহের মধ্যে গর্জে উঠেছিল। শুধু 'খাইবার' ও 'তলোয়ার' নামক জাহাজে এইসব ঘটনা ঘটেছিল তাই নয়, 'খাইবার' ও 'তলোয়ার' জাহাজের মতো আরও অনেক জাহাজেই এইরকম সেনাবাহিনীর মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ ও সংগ্রাম লক্ষ করা গিয়েছিল। এই নাটক পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের প্রাক্ মুহূর্তের। দেশের নানা প্রান্তে তখন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন স্বাধীনতা লাভের উত্তেজনায় ফেটে পড়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। ভারত ছাড়ো আন্দোলন, শ্রমিক ধর্মঘট সারাদেশে এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। ঠিক তার পরেই সংঘটিত হয় নৌ-বিদ্রোহ। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ইন্ডিয়ান আর্মির ভারতীয় নৌবাহিনীতে বিদ্রোহ, এই বিদ্রোহ ভারতের ইতিহাসে নৌ-বিদ্রোহ বলা হয়। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় নৌবাহিনীর বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে 'কল্লোল' নাটকটি উৎপল দত্ত রচনা করেন। এই ঘটনা ভারতের রাজনীতিতে এক বিশেষ পরিবর্তনের ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এই নাটকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে উৎপল দত্ত অকপটে বলেন :

> *'কল্লোল' নাটক স্বাধীনতা সংগ্রামে নাবিক ও মজদুরদের বীরত্ব গাথাই শুধু বলেনি, বলেছিল কংগ্রেসি বেইমানদের দেশদ্রোহীতার কথা। অহিংস সত্যাগ্রহ যে আসলে সাম্রাজ্যবাদের দালালি, অস্ত্র ছাড়া যে জয় নেই এ কথা বলার প্রয়াস হয়েছিল।* [৫]

উৎপল দত্তের লেখা 'তীর' নাটকটি মিনার্ভা থিয়েটারে মঞ্চস্থ হল ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর। ১৯৬৭-এর নির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাজিত করে কংগ্রেস বিরোধী দল ও বামপন্থী রাজনৈতিক দলের জোট যুক্তফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গের শাসনক্ষমতায় আসীন হয়। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি অঞ্চলে কৃষকদের সশস্ত্র আন্দোলন শুরু হয়। বেনামি জমি উদ্ধার, খাস জমি বন্টন নীতি প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে ৩০ লক্ষ খেতমজুরদের সঙ্গে প্রশাসনের পুলিশের সংঘর্ষ বাঁধে। আদিবাসী কৃষক পুরুষ, রমণী বেশিরভাগ এতে যোগ দেয়। উত্তরবঙ্গের আদিবাসী সমাজের এই সংগ্রামকে দমিত করতে স্বাধীন দেশের যুক্তফ্রন্ট

সরকার নির্বিচারে গুলি চালায়। উত্তরবঙ্গের এই মর্মান্তিক গুলি চালানোর ঘটনায় সাত কৃষকরমণী ও দুইজন শিশু নিহত হয়েছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উৎপল দত্ত লিখলেন তাঁর 'তীর' নাটকটি। তীর, ধনুক, টাঙ্গি, বল্লম নিয়ে কৃষকরা সেদিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছিল এবং আমৃত্যু বীরের মতো লড়াই করেছিল। উৎপল দত্ত 'তীর' নাটক লেখার সময় নকশালবাড়ি অঞ্চলে ১৫ দিন ছিলেন, উত্তরবঙ্গের কৃষকদের মধ্যে ঘুরেছেন। জেনেছেন কৃষকদের জীবন সংগ্রামের কথা— তাদের দুঃখ কষ্ট ও শোষণের কাহিনি। নাটকে রয়েছে ঐক্যবদ্ধ কৃষক সমাজ যেখানে হিন্দু, মুসলিম, ওরাওঁ, রাজবংশী, নেপালি ঐক্যবদ্ধ; অন্যদিকে রয়েছে জোটবদ্ধ পুলিশ জোরদার— সেনাবাহিনী প্রশাসন। উৎপল দত্ত স্থির করলেন এ ঘটনার উপরে নাটক লিখবেন। উৎপল দত্তের কথায়—

> *মনে করেছিলাম প্রসাদুজোতে পুলিশের নৃশংস গুলি চালানোর বিরুদ্ধে আমাদের মুখ খুলতেই হবে, যেই সরকার থাকুক না কেন। আরো ভেবেছিলাম কৃষক যোদ্ধার বীরত্ব অমর গাঁথা হয়ে থাকবে।* [৬]

এ ঘটনা বাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিশেষ একটা পটপরিবর্তন করেছিল। বলাবাহুল্য উৎপল দত্তের অতি বাম রাজনৈতিক চিন্তাধারা এখান থেকেই সূত্রপাত হয়েছিল।

'তীর'-এর পরবর্তী নাটক ছিল 'মানুষের অধিকারে'। এটি উৎপল দত্ত লিখেছিলেন ১৯৬২ সালে, মঞ্চস্থ করেন ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে। মানুষের অধিকারে নাটকটি প্রযোজনা করে উৎপল দত্ত প্রমাণ করেছিলেন আন্তর্জাতিক ভাবনার শরিক তিনি। বিশ্বের রাজনৈতিক ঘটনাবলি তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি, তার দৃষ্টান্ত হল এই 'মানুষের অধিকারে' নাটকটি। দেশে দেশে, কালে কালে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের প্রতি শ্বেতাঙ্গ মানুষদের যে বর্ণবিদ্বেষী ঘৃণা ও অত্যাচার চলে এসেছে, উৎপল দত্ত ইতিহাসের পাতা থেকে সেই ঘটনাটিকে তুলে এনেছেন আলোচ্য নাটকে। এই বর্ণবিদ্বেষী নির্মমতার বিরুদ্ধে মানুষের জেহাদ প্রতিবাদ প্রতিরোধকে সোচ্চার করে তুলেছেন।

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের সেই কুখ্যাত স্কর্ট্সবরো মামলা অবলম্বনে মার্কিন মুলুকে কৃষ্ণাঙ্গ পীড়নকে কেন্দ্র করেই এই নাটকটা। কৃষ্ণাঙ্গরা আজ জেগে উঠেছে, আর শুধু পড়ে পড়ে মার খাওয়া নয়। 'মারের বদলা মার'-এর নীতিকে বিশ্বাস করে কৃষ্ণাঙ্গরা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে, শ্বেতাঙ্গ অত্যাচারের মোকাবিলা করেছে রাইফেল নিয়ে। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের এই সাম্প্রদায়িক বিরোধ আমেরিকান ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা, যা আমেরিকা তথা সারা বিশ্বের রাজ্য রাজনীতিকে তোলপাড় করে তুলেছিল। উৎপল দত্ত সুকৌশলে সেই ঘটনাটিকে এখানে তুলে এনেছেন। উৎপল দত্ত এই 'মানুষের অধিকারে' নাটক সম্পর্কে বলেন—

১৯৩১-এর কুখ্যাত স্কট্‌সবরো মামলা অবলম্বনে মার্কিন মুলুকে কৃষ্ণাঙ্গ পীড়নের এই নাটকটি...আফ্রো-মার্কিন সংগীতে এলাবামার তুলার ক্ষেতের পারে পেন্টরক রেল স্টেশনে ও ডেকটুর শহরের আদালতের দৃশ্যসজ্জায়, পোষাকে, হাবভাবে, মেকাপে, সমবেত অভিনয়ে...যথাযথ ও শক্তিমান হয়ে উঠেছিল। [৭]

মিনার্ভা থিয়েটারে 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ'-এর নাট্যাভিনয়ের একেবারে শেষ পর্যায়ে 'যুদ্ধংদেহী' নাটকটি অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় ২৪ নভেম্বর ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে 'মিনার্ভা থিয়েটারে'। মতান্তরে ১১ ডিসেম্বর ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে। নাটকটিতে দেখানো হয়েছে যুদ্ধের হাঁকডাক রাষ্ট্রনেতাদের নিজস্ব প্রয়োজনে সৃষ্টি করা হয় এবং দেশের অভ্যন্তরে জনসাধারণের মধ্যে যখন বিক্ষোভ জানাতে থাকে, তখন তাকে প্রশমিত করে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার একটা রাজনৈতিক কৌশল হল যুদ্ধ। দেশপ্রেমের জিগির তুলে বহু মানুষকে খাদ্য ও অর্থের লোভ দেখিয়ে যুদ্ধে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, আর বাকি দেশকে বোঝানো হয়— এখন যুদ্ধ চলছে, দেশকে রক্ষা করাই মহান ব্রত, সবকিছু ত্যাগ স্বীকার করা অবশ্য কর্তব্য। 'যুদ্ধংদেহী' নাটকের উৎপল দত্ত ভারত ইতিহাসের কল্পিত রূপকের আড়ালে বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রশক্তি পাকিস্তানের সঙ্গে সীমান্ত সংঘাতকে তীব্র কশাঘাত হেনেছেন। যুদ্ধ যে একটি কৌশল এবং প্রকারান্তরে একটি ব্যবসা তা তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছেন আলোচ্য নাটকে। রাষ্ট্রনেতাদের পেট বাজানো এবং মুনাফা বৃত্তি সাধিত করা, উৎপল দত্ত ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ও শান্ত আক্রমণ করে দর্শকের সামনে তুলে ধরেছেন।

'লিটল থিয়েটার গ্রুপ'-এর গর্ভে জন্ম নিয়েছিল 'পিপলস্ লিটল থিয়েটার'। আন্তর্জাতিক থিয়েটার আন্দোলনের অভিজ্ঞতা নিয়ে তাতে জুড়ে দিলেন 'পিপলস্' শব্দটি। এই নতুন নামকরণের ফলে নতুন ভাবনার হাতিয়ার হয়ে উঠল 'পিপলস্ লিটল থিয়েটার'। এই নতুন নামকরণের এর ব্যাখ্যা উৎপল দত্ত পরবর্তী একটা সাক্ষাৎকারে বলেছেন; তাঁর কথায়—

কেননা ততদিনে মনে হচ্ছে 'পিপলস' কথাটা সর্বত্র জুড়ে দেওয়া উচিত, কেননা, 'লিটল থিয়েটার' যে আন্দোলন ইংল্যান্ডে শুরু হয়েছিল ১৯০৫ সালে সেটা ছিল শুধুই এক্সপেরিমেন্ট ফর এক্সপেরিমেন্ট সেক; পরীক্ষামূলক নাটক এর জায়গা। কিন্তু আমাদের যেটা মতবাদ, মতাদর্শ এখন অনেক পাল্টে গেছে। আগে পিপলস কথাটা না নিয়ে এলে আমাদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হচ্ছে না দর্শকের কাছে। [৮]

'পিপলস্ লিটল থিয়েটার'-এর প্রথম এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা হল 'টিনের তলোয়ার'। প্রথম অভিনয় হয় ১২ আগস্ট ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রসদনে। বাংলা নাটকের ইতিহাসে

যে গুটিকয়েক নাটকের নাট্যসাহিত্য হিসেবে আলাদা করে বিচার করা যায়, 'টিনের তলোয়ার' তার মধ্যে অন্যতম প্রধান। এই নাটকটি থিয়েটার প্রযোজনা ও নাটক অভিনয়ের ইতিহাসে এক মাইল স্টোন হিসেবে পরিচিত। বাংলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ও প্রতিষ্ঠার ১০০ বছর স্মরণে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল। এটি বোধহয় উৎপল দত্তের সবচেয়ে উপভোগ্য একটি নাটক।

বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্ব থেকেই নাটক ও নাটক অভিনয়ে ব্রিটিশ বিরোধিতা প্রকাশ পাচ্ছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের গণ্ডীতে এদেশ তখন আবদ্ধ। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ব্রিটিশরা এদেশের থিয়েটারের কণ্ঠরোধ করার জন্য এক কুখ্যাত আইন চালু করেন, তার নাম অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন (১৮৭৬)। এই কুখ্যাত আইন বাংলা থিয়েটারকে কীভাবে কণ্ঠরোধ করেছিল, এসবের মধ্য থেকেই কীভাবে বাংলা নাটক নানা রকম প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিল তার আলেখ্য রচিত এই 'টিনের তলোয়ার' নাটক। শিল্পীরা সব সংশয় অতিক্রম করে কীভাবে থিয়েটারের শোষক ও দেশের শাসক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সদর্পে রুখে দাঁড়ালেন তার এক অবিস্মরণীয় রূপ হল 'টিনের তলোয়ার'। উৎপল দত্ত একবার একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন—

> *বাংলা নাট্যজগতে কিছু খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী প্রচার করে চলেছেন বাংলায় নাকি রাজনৈতিক থিয়েটারের জন্মই হয়নি এখনো, বাংলা রাজনৈতিক নাটকের কোন অস্তিত্বই নেই; এই প্রচার এর বিপরীতে আমরা মনে করি, বাংলা রাজনৈতিক নাটক ও রাজনৈতিক নাট্যশালার অস্তিত্ব অবশ্যই আছে এবং এই রাজনৈতিক থিয়েটার ও রাজনৈতিক নাট্য আন্দোলন গড়ে উঠেছে গত ১০০ বছর ধরে।* [৯]

উৎপল দত্ত 'ব্যারিকেড' নাটকটির প্রযোজনা করেন ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম অভিনয় হয় ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে, কলামন্দিরে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচনে সিপিআইএম পশ্চিমবঙ্গে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল, এবং এরপর ক্ষমতা দখলের জন্য অত্যাচার, ব্যাপক র‍্যাগিং করা ছাড়া কংগ্রেসের সামনে আর কোনো রাস্তা ছিল না। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে তারা গুলি চালিয়ে, বোমা মেরে, ভোটারদের ভয় দেখিয়ে, সন্ত্রস্ত করে বুথ থেকে তাড়িয়ে, তারা বুথ দখল করল বন্দুক উঁচিয়ে নিজেদের ইচ্ছামতো ভোটদান করল। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনের ঠিক আগে বামপন্থী নেতা হেমন্ত বসুকে হত্যা করেন কিছু অজ্ঞাতপরিচয় লোক। কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা এই হত্যার দায় সিপিআইএমের উপর চাপিয়ে দেয়, চলতে থাকে বামপন্থী কর্মীদের উপরে পুলিশি নির্যাতন, অত্যাচার ও নিপীড়ন। এ সবকিছুই ঘটেছিল প্রকাশ্য দিবালোকে গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এবং চরম লজ্জার কথা এই যে বুদ্ধিজীবীদের তরফ থেকে কোনো রকম প্রতিবাদ করা

হয়নি। বুদ্ধিজীবীদের এই নীরবতা উৎপল দত্তকে ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল; একই সঙ্গে তাকে ক্রুদ্ধ করেছিল শাসক শ্রেণির এই বেপরোয়া সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। উৎপল দত্ত প্রত্যাঘাতের পথে এগোলেন তাঁর নাটক নিয়ে। এ সময় বামপন্থী কর্মীরা তাদের বাড়ি থাকতে পারছে না, তারা কর্মক্ষেত্রে যেতে পারছে না। এসব ঘটনা নিয়ে তিনি লিখে ফেললেন 'ব্যারিকেড' নাটকটি। উৎপল দত্তের কথায়—

> *তখন চতুর্দিকে ফ্যাসিস্ট শক্তির উত্থান ঘটেছে, সিপিআইএম এর একজন সদস্য ও তখন নিজের বাড়িতে থাকতে পারছেন না, তারা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে যেতে পারছেন না, এহেন অবস্থায় প্রচণ্ড ক্রোধে আমি নাটক লিখলাম— 'ব্যারিকেড'।*[১০]

নাটকটি জার্মানির হিটলারের উত্থানের পটভূমিকায় রচিত হলেও নাট্যগঠন, সংলাপ ঘটনাবলি এমন এক আশ্চর্য দক্ষতায় তুলে ধরা হয়েছিল যে দর্শকদের এটা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি যে জার্মানির ঘটনার মধ্য দিয়ে আসলে বাংলার কথাই বলা হচ্ছে।

উৎপল দত্ত তার সমসাময়িক রাজনৈতিক বিভিন্ন ঘটনাবলি যা ভারত তথা বিশ্বের ইতিহাসকে নাড়া দিয়েছিল, সেইসব ঘটনাবলি অবলম্বন করে যেমন নাটক রচনা করেছেন, তেমনি ভারতের অতীত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস যা বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে ও বাংলা তথা ভারতের রাজনীতিকে নাড়িয়ে দিয়েছিল, এমন কিছু ঘটনাকে কেন্দ্র করে ও নাটক রচনা করেছেন। তার মধ্য অন্যতম হল 'টোটা' নাটকটি। 'ব্যারিকেড'-এর পরের নাটকটি ছিল 'টোটা'। প্রথম অভিনয় হয় ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির 'আইফাক্স' হলে। পরে কলকাতায় অভিনীত হয় 'রবীন্দ্রসদনে', ১লা জুলাই। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহীদের যে আন্দোলন, ইতিহাসে 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামে পরিচিত, সেই বিদ্রোহ ব্রিটিশ রাজশক্তির ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল, তারই পটভূমিকায় 'টোটা' নাটকটি লেখা হয়। পরবর্তী সময়ে 'টোটা' নাটকের কিছু অংশ বাদ দিয়ে এবং কিছু অংশ সংযোজন করে নতুন নামকরণ হয় 'মহাবিদ্রোহ'।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের সিপাহীরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ শাসনের কবল থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিল। বিগত ১০০ বছর ধরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদেশের নির্মম শাসন শোষণ চালিয়ে এদেশের অর্থনীতি, শিক্ষা ও জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। সিপাহীদের সংগ্রাম ছিল এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, যা ভারতের মহাবিদ্রোহ বলে পরিচিত। এই মহাবিদ্রোহকে পটভূমিকা করে উৎপল দত্ত এই নাটকটি রচনা করেছিলেন।

উৎপল দত্তের আরেকটি স্মরণীয় রাজনৈতিক নাট্য প্রযোজনা 'দুঃস্বপ্নের নগরী'। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ১৬ মে প্রথম অভিনয় হয়। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে সাধারণ নির্বাচন জিতে কংগ্রেস সিদ্ধার্থ শংকর রায়-এর মুখ্যমন্ত্রীত্বে পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠন করল। ক্ষমতা কায়েম করতে সব রকমের অত্যাচার দমন-পীড়ন সন্ত্রাস চালিয়ে যেতে থাকল এই কংগ্রেসি সরকার ও তার মদতপুষ্ট গুণ্ডার দল। রাজনৈতিক নেতা, প্রশাসনিক কর্তা, গুণ্ডা মাস্তান ও কিছু তাঁবেদার সংবাদমাধ্যমের নির্লজ্জ আঁতাত— সবমিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গে একরকম হেস্তনেস্ত অবস্থা। শাসক শ্রেণির দ্বারা জনতার উপরে যে দুর্বিষহ অত্যাচার চলছিল, বামপন্থী নেতাকর্মীরাও সমানভাবে অত্যাচারিত, নিপীড়িত হচ্ছিলেন। তারা না পাচ্ছিলেন স্বাধীনভাবে চলতে, না পাচ্ছিলেন কর্মক্ষেত্রে যেতে। তখন কলকাতা সত্যি দুঃস্বপ্নের নগরী হয়ে উঠেছিল সাধারণ মানুষের কাছে। রাষ্ট্রীয় শক্তির সহায়তায় গুণ্ডা মাস্তান ও পুলিশ— উৎপল দত্ত সমসাময়িক রাজনীতির বিষয়কে নাটকে নিয়ে এলেন— একেবারে সোজাসুজি প্রত্যক্ষভাবে— নাট্য প্রযোজনায় নিজের দেশের সমকালের জ্বলন্ত চিত্র আঁকলেন।

উৎপল দত্তের 'দুঃস্বপ্নের নগরী'ও তৎকালীন সরকারের ভাড়াটিয়া গুণ্ডাদের হাতে বারে বারে আক্রান্ত হয়েছে, পুলিশের দ্বারা নিগৃহীত হয়েছে। এমনকি নাটকটি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এ নাটকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করা হয়েছে। উৎপল দত্তের ভাষায়—

> *আমাদের 'দুঃস্বপ্নের নগরী'— তখন বেআইনি হলো; শুধু বেআইনি হলো না, প্রহৃতও হলো; যেখানেই অভিনয় করতে যাচ্ছি সেখানেই প্রহার।* [১১]

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে সারা ভারতে জরুরি অবস্থা জারি হয়। এই জরুরি অবস্থার পটভূমিকে কেন্দ্র করে উৎপল দত্ত আরেকটি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নাটক প্রযোজনা করেন, যার নাম 'এবার রাজার পালা' নামে নাটক, প্রথম অভিনয় হয় ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে। ভারতবর্ষ জুড়ে তখন ইমারজেন্সি বা জরুরি অবস্থা চলছে। কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন-শোষণ, তর্জন-গর্জনে দেশময় সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক জীবন জরুরি অবস্থার সন্ত্রাসে একেবারে থমকে গিয়েছিল। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধি তখন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী, তারই শাসনকালে তার স্নেহধন্য পুত্র সঞ্জয় গান্ধির রাজনীতিতে আবির্ভাব। ইমারজেন্সির সুযোগ নিয়ে সঞ্জয় গান্ধি তখন সর্বময় কর্তা হয়েছেন, দেশের রাজনীতিতে। সে এক অরাজক ভয়ানক অবস্থা। ইন্দিরা গান্ধি ও তার চক্র ভারতের সংবিধানকে নিলর্জ্জভাবে পদদলিত করলেন, ভারতবাসীর সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিলেন। এই জরুরি অবস্থার পটভূমিতে উৎপল দত্ত লেখেন, 'এবার রাজার পালা' যেটি ছিল তার অন্যতম প্রিয় নাটক। এই নাটকে উৎপল দত্ত স্বৈরাচারী শাসকদের এক ধরনের পাগল হিসেবে চিত্রায়িত করলেন। এই পাগলরা যখন দেশের দায়িত্বভার নেয় তখন অনিবার্যভাবে তারা দেশের

সংবিধানকে তছনছ করে দেশের আইনকে পদপিষ্ট করে, মানুষের অধিকার হরণ করে। উৎপল দত্ত এই জটিল বিষয়কে হাস্যরসের মধ্য দিয়ে, অতুলনীয় কমেডির মধ্য দিয়ে বুদ্ধিদীপ্তভাবে 'এবার রাজার পালা' নাটকটিকে চিত্রিত করেন। স্বৈরাচারী শাসকদের হাস্যকর করে তোলেন জনতার কাছে।

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে যারা ভারতব্যাপী জরুরি অবস্থার পটভূমিতে উৎপল দত্ত আর একটি নাটক প্রযোজনা করেন। নাটকটি হল 'লেনিন কোথায়'। এই নাটকে দেখানো হল দুর্বিষহ রাজনৈতিক পোষণ ও শাসন। এই দুর্বিষহ অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টি ও কর্মীদের দুরবস্থা এবং এই দুরবস্থার মধ্য দিয়ে তাদের কি কর্তব্য তা বলা হয়েছে। রাশিয়ার প্রেক্ষাপটে লেনিন-এর নেতৃত্ব এবং প্রাক্‌বিপ্লবকালে পার্টিকর্মীদের ও সাধারণ মানুষের অবস্থা খুব সুন্দরভাবে এই নাটকে বলা হয়েছে। জনগণ তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে নানা আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে। কংগ্রেস বিরোধী নানা রাজনৈতিক দলের বহুমুখী আন্দোলন নানা আকারে সারা ভারতে সংঘটিত হয়ে চলেছে। জোটবদ্ধ অবস্থায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কংগ্রেস ও তার নেত্রী ইন্দিরা গান্ধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। গুপ্তহত্যা, জেলে বন্দি করে রাখা, নানা উৎপীড়ন চালিয়ে বিরোধীদের এই প্রতিবাদ, এ আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা, সরকার পক্ষ থেকে নিরন্তর করা হয়েছিল। এরকম একটা পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে উৎপল দত্ত রচনা করলেন 'লেনিন কোথায়'।

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে থেকে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত মোটামুটি এই সময়ে কেন্দ্রে অংগ্রেসি সরকার ছিল। এই সময় ক্ষমতায় আসে জনতা পার্টির নেতৃত্বে কিছুটা হিন্দুত্ববাদ ঝোঁকের সরকার। এইসময় উৎপল দত্ত যেসব নাটক প্রযোজনা করেছিলেন সেগুলোর মধ্য স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায় স্বৈরতন্ত্র বিরোধী সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী নাটক সৃষ্টির প্রচেষ্টা। উৎপল দত্তের কথায়—

> *দিল্লির ঘুষ আর লম্পটের রাজ্যে অধিষ্ঠিত বোধকরি আজ বিশ্বের সবচেয়ে পশ্চাত্‌পদ সবচেয়ে বিজ্ঞানবিরোধী একদল উচ্চবর্ণ হিন্দু।* [১২]

১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে উৎপল দত্ত মঞ্চস্থ করেন 'তিতুমির', যার বিষয়বস্তু ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের আপসহীন সংগ্রাম। ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ভাষার বিরুদ্ধে একটা জোরালো প্রতিবাদ। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে তিতুমিরের নেতৃত্বে যে কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল তারই পটভূমিকায় এই নাটকটি লেখা হয়। ভারতের পরাধীন ইতিহাসে এক বিতর্কিত চরিত্র এই তিতুমীর। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে দেশবাসীর বিদ্রোহের এক পুরুষ চরিত্র হিসেবে তিতুমীরকে উৎপল দত্ত গ্রহণ করেছেন। হিন্দু জমিদারদের, অন্যায় অত্যাচর ইসলাম ধর্মবিরোধী বিভিন্ন আইন— এগুলোর বিরুদ্ধে তিতুমীরের আন্দোলন। প্রথমদিকে এই আন্দোলন মুসলমান

মৌলবাদকে সামনে রেখে এগোলেও পরবর্তী সময়ে এই আন্দোলন হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত লড়াইয়ে পরিণত হয়। ইংরেজ শাসনের ভিত নাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল এই আন্দোলন, যা ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

উৎপল দত্ত 'শৃংখল ছাড়া' নাটকটি প্রথম অভিনয় হয় ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে। কাল মার্কস এর মৃত্যু শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এই নাটকটি উৎপল দত্ত রচনা ও মঞ্চস্থ করেন। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির বার্ডেন অঞ্চলে বিপ্লব এর কাহিনি থেকে এই নাটকটি লেখা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে পুনরায় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে। কিন্তু কেন্দ্রে কংগ্রেসি সরকার। এই কংগ্রেস সরকার নানা চক্রান্ত করে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের উপর যাতে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারকে অপদস্ত ও বরখাস্ত করা যায়। তার জন্য নানা চক্রান্ত ও সৃষ্টি-অনাসৃষ্টি নিরন্তর প্রচেষ্টা করে চলেছে। দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের এই রাজনৈতিক সংকটের মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ ও জনতার মানসিক বিকাশের। রাজনৈতিক সংকটের এই মুহূর্তে উৎপল দত্ত বিপ্লবীদের মহান নেতা কার্ল মার্কসকে স্মরণ করে এবং জার্মানির বার্ডেন অঞ্চলের লড়াকু মেহনতী জনতার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের পটভূমিকায় আলোচ্য নাটকটি রচনা করেন।

> *পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরেও প্রয়োজন ছিল শ্রমিক শ্রেণীর আরো রাজনৈতিক পরিপক্কতা, স্বৈরতন্ত্রকে পরাজিত করার জন্য প্রয়োজন ছিল বুর্জোয়াদের মধ্যকার দ্বন্দ্বকে নিজেদের কাজে লাগাবার, ব্যাখ্যা করার দরকার ছিল কেন শৃংখল ছাড়া মেহনতিদের হারাবার কিছু নেই।... কালমার্কসের মৃত্যু শতবর্ষে উৎপল দত্তের নাটক সেই কাজটাই করার চেষ্টা করেছিল।* [১৩]

মহাত্মা গান্ধির জীবনের শেষ আট মাস অবলম্বন করে লিখলেন 'একলা চলো রে' নাটকটি। প্রথম অভিনয় ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে। গান্ধি ও গান্ধিবাদের দ্বন্দ্ব, দেশভাগ ও স্বাধীনতা প্রাপ্তির, গান্ধি হত্যা ইত্যাদি বিষয় উৎপল দত্ত নাটকটিকে তুলে ধরলেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। ভারতের স্বাধীনতার আগে ও পরে কয়েকমাসের ঘটনা নিয়ে এই নাটক। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে গান্ধিজি হত্যার কিছু পূর্বের ও পরের কয়েক মাস এই নাটকের ঘটনাকাল। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের চক্রান্তের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এদেশের কিছু লোভী, স্বার্থপর মানুষ ক্ষমতা লাভের জন্য দেশবিভাগ মেনে নিয়েছিল। সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ রেখে ইংরেজ ভারতবর্ষকে দু'টুকরো করে ক্ষমতা ভাগ করে দিয়েছিল কিছু লোভী মানুষের হাতে। গান্ধিজি দেশভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, বরং তিনি দেশভাগ মেনে নিতে পারেননি। তিনি চেয়েছিলেন দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং ভারতের

স্বাধীনতা। তার ফলশ্রুতি হিসেবে শাসকবর্গের চক্রান্তে গান্ধিজিকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। দেশের এই উত্তাল পরিস্থিতিতে উৎপল দত্ত 'একলা চলো রে' নাটকটিতে সুন্দরভাবে নিপুণতার সঙ্গে তুলে ধরেন।

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙাগড়ার ইতিবৃত্তে উৎপল দত্তের নাটক ও তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ

উৎপল দত্ত সমস্ত জীবন মার্কসবাদী আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। মার্কসীয় দর্শন সমস্ত জীবন ধরে তিনি লালন পালন ও ধারণ করে গেছেন। তাঁর নাটকের প্রায় প্রতিটি আঙ্গিকে মার্কসীয় ধ্যান-ধারণা চিন্তাভাবনা ও তার আদর্শের কথা পরিলক্ষিত। উৎপল দত্ত একান্তভাবেই সাম্রাজ্যবাদ-ঔপনিবেশিকতাবাদ এবং ফ্যাসিবাদ বিরোধী একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির নাট্যকার ছিলেন। ত্রিশের দশকে অর্থনৈতিক সংকট তীব্রতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাসিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী লোভ ও বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, পুঁজিবাদী শক্তি বৃদ্ধি পায়। তার ফলে শ্রমিক আন্দোলনের তীব্রতা যেমন বৃদ্ধি পেল, তেমনি কমিউনিস্ট মতবাদের ব্যাপক প্রসার ঘটে। এই ফ্যাসিবাদ এইসময় কমিউনিজমের ভীষণতম শত্রু হিসেবে আবির্ভূত হল। যেসকল সংগ্রাম বিদ্রোহ ও প্রতিরোধের কাহিনি উৎপল দত্তকে মোহিত করে। বিষয় বৈচিত্র্যে ভরপুর উৎপল দত্তের প্রতিটি নাটকই দ্বন্দ্বমূলক, বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা রচিত। ছোটো থেকেই উৎপল দত্ত মার্কসীয় আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি এক বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করতেন। একজন মার্কসবাদী ঠিক কী করে কীভাবে মার্কসবাদী আর্দশে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন, সঠিকভাবে তার নিজের পক্ষে বলা মুশকিল। উৎপল দত্ত যখন স্কুলে পড়তেন তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লাল ফৌজের প্রতিরোধ ও পরাক্রমের কাহিনি পড়ে বিস্মিত ও অবাক হয়েছেন। স্কুল ছেড়ে যখন তিনি কলেজে প্রবেশ করলেন, কলেজে পা দিয়েই মার্কস, এঙ্গেলস্ লেনিন, স্তালিন এমনকি হেগেল বা ফয়েরবাখ প্রভৃতি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন। উৎপল দত্তের রাজনৈতিক চেতনা অঙ্কুরিত হচ্ছিল স্কুলে পড়ার সময় থেকেই। তাঁর ভাষায়—

> *স্কুলে থাকতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লাল ফৌজের প্রতিরোধ ও পরাক্রমের কাহিনি পড়ে চমকৃত হতাম। স্তালিনের সহজ ভাষায় লেখা প্যামফ্লেট ও বই তখন থেকে পড়েছি। স্কুল শেষ হতে না হতে লেনিন, মার্কস, এঙ্গেলস্— এমনকি হেগেল, ফায়ের বাখ, কান্ট প্রমোশন নিয়েছি।*[১৪]

মার্কসবাদী চিরায়ত সাহিত্যের এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে তিনি কলেজে প্রতিনিয়ত ছাত্র ইউনিয়নের সভা সমিতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের মুণ্ডুপাত লক্ষ করেন, লক্ষ করেন পথে-ঘাটে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের আক্রান্ত হতে। এরপর 'গণনাট্য সংঘ'-এ যোগদান করে তিনি সরাসরি যুক্ত হয়ে পড়েন সেই সময়কার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পরিস্থিতি নিয়ে বাক্‌বিতণ্ডা মতপার্থক্য ও বিভিন্ন বিষয়ের বিচার-বিশ্লেষণে। সে সময় তাঁর চোখের সামনে ঘটতে থাকে কমিউনিস্ট পার্টির উপরে নানান রকম অত্যাচার ও বেআইনিকরণ। বন্দিদের উপরে গুলি চালানো, কাকদ্বীপে নারী হত্যা, ডিব্রুগড়ে গণনাট্য সংঘের অনুষ্ঠানে গুলি বর্ষণ, হাজরা পার্কের সমাবেশে ও বউবাজারে নারী মিছিলের উপরে বেপরোয়া গুলি বর্ষণ— এইসব ঘটনা বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলেছিল তাঁর ব্যক্তি জীবনে ও তার নাটকে। এসব ঘটনাক্রম উৎপল দত্তকে মার্কসবাদের প্রতি আরও আকৃষ্ট করে তোলে—

> *তখন একেবারে উত্তাল কলকাতার রাস্তা এবং আক্রান্ত হচ্ছে কমিউনিস্টরা। বিয়াল্লিশ সালে কি করেছিল? নেতাজীকে কি বলেছিল? এইসব তুলে কংগ্রেসীরা আক্রমণ করছে কমিউনিস্টদের। এই প্রথম আমার চোখের সামনে কালীঘাটের পার্টি অফিস আক্রান্ত হয় এবং সেখান থেকে কমরেডদের টেনে বার করে করে রাস্তায় ফেলে মারছে, এইসব আমি দেখি। কলেজ যাতায়াতের পথে।* [১৫]

এইসব দেখে শুনে তার মনে অত্যাচারিতদের প্রতি সমবেদনা বা সহমর্মিতা জাগ্রত হয়। উৎপল দত্তকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, তিনি মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন কোন সময় থেকে? উৎপল দত্ত জবাবে বলেছিলেন—

> *হওয়া উচিত ছিল ছাত্রাবস্থা থেকে। কিন্তু সেন্ট জেভিয়ার্সে কোন ইউনিয়ন পর্যন্ত ছিল না। এমন একটা কলেজ। ছাত্র ফেডারেশন তো দূরের কথা।* [১৬]

উৎপল দত্ত স্কুলে ও কলেজে যে সমস্ত বইপত্র পড়েছিলেন তা বামপন্থী রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট করেছিল এবং বামপন্থীদের উপরে কংগ্রেসিদের যে অকথ্য অত্যাচার তা তাঁকে মার্কসবাদের প্রতি সমব্যথী করে তুলেছিল। কিন্তু মার্কসবাদীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া আর নিজে মার্কসবাদী হওয়া দুটো এক জিনিস নয়। উৎপল দত্ত নিজেকে মার্কসবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন কলেজ ছাড়ার পর থেকে। এরপর থেকে সারাজীবন উৎপল দত্তের রাজনীতি ছিল মার্কসবাদের রাজনীতি। সমাজ-শোষণ ও রাজনৈতিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে জাগ্রত জনতার সমবেত প্রতিরোধ ও সংগ্রামের রাজনীতি। সমকালীন সময়ে তিনি মার্কসবাদের প্রতিটি ভাঙাগড়ার

বৃত্তান্ত ও তাদের রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগ্রামের বৃত্তান্ত গভীরভাবে তিনি অনুধাবন করেছেন এবং রাজনৈতিক ঘটনা বৃত্তান্তকে তার নাট্য সৃষ্টির মধ্যে অতি নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে তিনি তুলে ধরেছেন। উৎপল দত্তের মার্কসীয় ভাবাদর্শ, চিন্তাভাবনা ও মতাদর্শ গভীরভাবে অনুধাবন করতে গেলে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা, গঠন ও আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা প্রাসঙ্গিক।

দেশে দেশে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার প্রেরণা জোগাতে লেনিনের উদ্যোগে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক (কমিন্টার্ন) স্থাপিত হয় ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে । এই পটভূমিকায় ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ অক্টোবর মাসে মানবেন্দ্র রায়ের সক্রিয়তায় সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসখন্দ শহরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতিষ্ঠার সময় পার্টির সদস্য হন সাতজন। পার্টির সম্পাদক হন মহম্মদ শাফিক সিদ্দিকী। (কমিন্টার্ন) ১৯১৯-৪৩ নির্ধারিত নীতি অনুসারে এবং ভারতের পরিস্থিতির উপযোগী একটি কর্মসূচি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয় পার্টি তার প্রতিষ্ঠিত সভায়। কমিন্টার্ন ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে সিপিআই-কে গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ১৯২১-২২ খ্রিস্টাব্দ থেকে দেশের কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লাহোর, কানপুর শহরকে কেন্দ্র করে পার্টি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন মোজাফ্ফর আহমেদ, এস এ ডাঙ্গে, সিঙ্গারা ভেলু চেট্টিয়ার, গোলাম হোসেন প্রমুখ নেতারা। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমশ একটা মূল ধারা হয়ে ওঠে এই কমিউনিস্ট আন্দোলনের ধারা।

প্রতিষ্ঠা পর থেকেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করে আসে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৩৬তম অধিবেশন হয় আমেদাবাদে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ও ৩৭ তম অধিবেশন হয় গোয়ায় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে। এই অধিবেশনগুলিকে কেন্দ্র করে সিপিআই-এর পক্ষ থেকে প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য ইস্তেহার প্রকাশ করা হয়। তাছাড়া কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব ও উত্থাপন করা হয়।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম থেকেই ব্রিটিশ শাসকের কাছে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। ফলে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে থেকেই এই পার্টির উপর আক্রমণ নেমে আসতে থাকে। ১৯২১ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে পাঁচটা পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯২৩ থেকে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে মিরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা চলে। বলা বাহুল্য সব কটাই সাজানো মামলা। কমিউনিস্ট আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি এতটাই ভয়াবহ ও তীব্র ছিল যে, পরাধীন ভারতে ১৯৩৪ থেকে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে এবং স্বাধীন ভারতে ১৯৪৮-৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই পার্টি নিষিদ্ধ থাকে।

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির, বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন অংশের মানুষকে তাদের নিজ নিজ দাবি সেইসঙ্গে দেশের স্বাধীনতার দাবিতে শামিল করার জন্য সিপিআই নানা শ্রেণি ও সংগঠন গড়ে তুলতে থাকে। অবশ্য কোনো কোনো সংগঠন স্থাপনে প্রাথমিকভাবে সিপিআই-এর অবদান ছিল না। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে সারা ভারত কৃষক সভা, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন গঠিত হয়, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয় 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ', ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' গঠিত হয়।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের পর পণ্ডিচেরী, গোয়া ও দেশের কিছু অংশ ঔপনিবেশিক শাসনে ছিল। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ফরাসিদের কবল থেকে পণ্ডিতচেরী ও অন্যান্য অংশ মুক্ত করা এবং ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজদের কবল থেকে গোয়া ও অন্যান্য অংশ মুক্ত করার ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। গোয়া মুক্তির জন্য ৩৫ জন দেশপ্রেমিক শহিদ হন, যাদের মধ্যে ২৭ জন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

দেশের স্বাধীনতা এবং সেইসঙ্গে দেশের মানুষের মুক্তির জন্য ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে পার্টি 'ড্রাফ্ট প্ল্যাটফর্ম অফ অ্যাকশন' নামে একটি দলিল হাজির করে। ভারতীয় জনসাধারণের সমস্ত অংশের সমস্যাবলি উপলব্ধি করে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ ঘটাতে একটা সর্বাঙ্গীণ কর্মপন্থা স্থির করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। বিশ শতকের দুই ও তিনের দশকের ফ্যাসিবাদ ক্রমশ সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে সবচেয়ে বড়ো বিপদ হিসেবে হাজির হয়। এই ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে যুক্ত করা জরুরি হয়ে পড়ে। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে কমিন্টার্ন-এর সপ্তম কংগ্রেস নির্দেশ দেয় যে— ভারতবর্ষে কমিউনিস্টদের সবরকম সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণআন্দোলনকে সমর্থন করতে হবে এবং তাতে অংশগ্রহণ করতে হবে, তাকে ব্যাপকতর করতে হবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের জনসাধারণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে আরও বাড়িয়ে তোলার জন্য সবরকম সাহায্য করতে হবে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই ভিন্ন ধারার স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ক্রমশ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। জাতীয় বিপ্লববাদী আন্দোলনে যারা ছিলেন, গদর পার্টির নেতা যারা ছিলেন, ভগৎ সিং-এর সহকর্মীরা, সূর্যসেনের সহযোদ্ধারা, সুভাষচন্দ্র বসুর সহযোদ্ধারা, ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারা অনেকেই পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। কমিউনিস্ট পার্টির ভাবধারা, আদর্শ ও কার্যপ্রণালী তাদেরকে প্রভাবিত করে; ফলে তারা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন ও বিভিন্ন আন্দোলনে শামিল হয়।

স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলোতে আন্দামানের সেলুলার জেল, রাজপুতানার দেউলি, বাংলার প্রেসিডেন্সি জেল ইত্যাদি দেশের নানা জেল ও বন্দি শিবিরগুলিতে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা 'কমিউনিস্ট কলসলিডেশ্ন' গড়ে তোলেন। বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে অনেকেই পরবর্তীকালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং নেতৃত্ব প্রদান করেন। এইভাবে কমিউনিস্ট পার্টিতে এসেছেন বাংলার প্রমোদ দাশগুপ্ত, নারায়ণ রায়, হরেকৃষ্ণ কোঙার, বিজয় মোদক, সুকুমার সেনগুপ্ত ও সত্যব্রত সেন প্রভৃতি দিকপাল মানুষেরা যারা মার্কসবাদকে আদর্শ করে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে ও ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে দুটো দলিল গৃহীত হয়। প্রথমটা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর কমিউনিস্ট ও ওয়াকার্স পার্টিগুলোর প্রতিনিধিদের ঘোষণা (বার পার্টির দলিল) এবং দ্বিতীয়টা একাশিটা কমিউনিস্ট ও ওয়াকার্স পার্টিগুলোর বিবৃতি (একাশি পার্টির দলিল) নামে পরিচিত। কিন্তু এইসব দলিলের পরস্পর বিরোধী ব্যাখ্যা হতে থাকে। তার সঙ্গে যুক্ত হয় আরও কিছু কমিউনিস্ট আন্দোলনের মতপার্থক্য। একদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি, অপরদিকে চিনের কমিউনিস্ট পার্টি। ১৯৬৩-৬৪ খ্রিস্টাব্দে এই বিতর্ক হয়ে দাঁড়ায় মতাদর্শগত মহাবিতর্ক। এর প্রতিক্রিয়া ঘটে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে।

১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে ভারত-চিন বিরোধ, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে সীমান্ত সংঘর্ষের চেহারা নেয়। দেশের মানুষকে উগ্র জাতীয়তাবাদী ভাবনায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে এর প্রভাব পড়ে। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে আবার পার্টির সাধারণ সম্পাদক অজয় ঘোষের জীবনাবসান হয়, সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন নিয়েও বিতর্ক শুরু হয়। কমিউনিস্ট পার্টির একটি অংশ মনে করেছিল ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি কোনো অখণ্ড সত্তা নয়। ভারতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যে দুটি বিপরীত গোষ্ঠীর অস্তিত্ব আছে, একটি গোষ্ঠী সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী ও সমাজতন্ত্রের পক্ষপাতী এবং অপর গোষ্ঠী ভারতের শিল্প বিকাশে আগ্রহী ও সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্রের বিরোধী, তারা প্রগতিশীল বুর্জোয়া শ্রেণি। এই প্রগতিশীল বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধিরা মনে করেছিলেন নেহেরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতার মধ্য দিয়েই ভারতের রক্ষণশীল সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করতে হবে, দেশকে আধুনিক শিল্প স্থাপনের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এটি ছিল কমিউনিস্ট পার্টির একটি অংশের মতো এবং এই অংশকে বলা হত পার্টির দক্ষিণপন্থী অংশ। অন্যদিকে পার্টির মধ্য অনেকেই ছিলেন যারা এই মতের বিরোধী— যাদের বলা হত বামপন্থী অংশ। তারা মনে করতেন এদেশের কংগ্রেসরাই জনগণের উপরে অত্যাচার, শোষণ ও নিপীড়ন করছে। কমিউনিস্ট পার্টি হল শোষিত, নিপীড়িত

ও অত্যাচারিত জনগণের পার্টি। সেদিক থেকে বিচার করলে অত্যাচারী শোষক কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতার কোনো প্রশ্নই আসে না। এরপর ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ভারত-চিন সীমান্তে সংঘর্ষের সময় নেহেরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস যে উদ্দেশ্যে প্রচার শুরু করেছিল তাকে পূর্ণ সমর্থন জানায় কমিউনিস্ট পার্টির দক্ষিণপন্থী অংশ। কংগ্রেস সরকার সরাসরি ঘোষণা করলেন— পবিত্র মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য শ্রমিকরা অতিরিক্ত শ্রমদান করবে, কোনো ধর্মঘট করবে না ও তাদের আত্মত্যাগ করতে হবে। শাসক শ্রেণির এই কথাগুলো প্রচার করে শ্রমিক শ্রেণির উপরে নির্দয় শাসন চাপিয়ে দিয়েছিল এবং এই কথাগুলোকে কমিউনিস্ট পার্টির দক্ষিণপন্থী অংশ নিজেদের কথা হিসেবে গ্রহণ করলেন। তারা এ কথাও বললেন যে, প্রয়োজনে কংগ্রেসের সঙ্গে যৌথভাবে সরকার গড়তে হবে দেশের সুরক্ষা ও অগ্রগতির স্বার্থে। স্বভাবতই, পার্টির বামপন্থী অংশ এই মত মেনে নিলেন না ও প্রকাশ্যে বিরোধিতা করলেন, ফলে পার্টির অভ্যন্তরীণ বিরোধ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

ক্রমে পার্টির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এমন জায়গায় পৌঁছায় যে, দক্ষিণপন্থী অংশ বামপন্থী অংশকে ‘চীনের দালাল’ বলে অভিহিত করলেন। কেননা তাদের মতে চিন-ভারত যুদ্ধের সময় বামপন্থী অংশ কংগ্রেস সরকারকে সমর্থন তো করেইনি বরং বিরোধিতা করেছেন এবং চিনের প্রতি সমর্থন ও সহমর্মিতা জানিয়েছেন। দক্ষিণপন্থী অংশ আরও দাবি করেন যে পার্টির মধ্যে বামপন্থীরা চিনের পার্টির তরফ থেকে প্রচার চালাচ্ছে। এইসব ‘চীনের দালালদের’ বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আর্জি জানালেন কংগ্রেস সরকারের কাছে। অচিরেই দেখা গেল কংগ্রেস সরকার কমিউনিস্ট পার্টির বামপন্থীর অংশের উপরে ব্যাপক আক্রমণ শুরু করে। ‘ভারত-রক্ষা আইন’-এর বলে কমিউনিস্ট পার্টির বামপন্থী অংশের সদস্যরা একে একে গ্রেফতার হতে থাকলেন। বামপন্থী অংশের উপরে নেমে এল অকথ্য অত্যাচার, আক্রমণ ও নিপীড়ন। অথচ দক্ষিণপন্থী অংশ কংগ্রেস সরকারের এই আক্রমণের কোনো প্রতিবাদ, বিরোধিতা তো করলেনই না বরং দেশ রক্ষার নামে এই আক্রমণ ও অত্যাচারকে সমর্থন করলেন। কমিউনিস্ট পার্টির দক্ষিণপন্থী অংশরা যখন বলেছিলেন কংগ্রেসকে সমর্থন করতে বা কংগ্রেসকে সমর্থন করে প্রকৃত দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যাবে, দেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়া যাবে— তখন বামপন্থীরা এই মতের বিরোধিতা করেছিলেন বরং তারা অভিযোগ করেছিলেন দক্ষিণপন্থী অংশরা কংগ্রেসের লেজুড়বৃত্তি করে যাচ্ছেন। দক্ষিণপন্থী অংশ শ্রেণি-সংগ্রামের পথ পরিত্যাগ করে শ্রেণি-সহযোগিতার পথ বেছে নিয়েছেন। তারা কমিউনিস্ট পার্টির মূল নীতিকে পদদলিত করে শ্রমিকশ্রেণি, কৃষক ও মজদুরদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। এই দ্বন্দ্ব ক্রমে ক্রমে তীব্র ও ব্যাপক চেহারা নিতে থাকে।

অবশেষে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দু-ভাগে ভাগ হয়ে যায়। দক্ষিণপন্থী অংশ থেকে যান সিপিআই-তে। অপরদিকে, বামপন্থী অংশ নতুন পার্টি গঠন করেন সিপিআই(এম)।

উৎপলরঞ্জন দত্ত কোনো পার্টির সদস্য ছিলেন না। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন একজন মার্কসবাদী এবং শোষিত, অত্যাচারিত, নিপীড়িত মানুষের গণবিপ্লবে বিশ্বাসী। বাংলা রাজনৈতিক থিয়েটারের প্রবক্তা হিসেবে তিনি গোড়া থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। অবশেষে তিনি ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের পরে সিপিআই(এম)-এর সঙ্গে যুক্ত হন। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানান,

> *বারম্বার রাজনৈতিক দলের পাশে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক নাটকই আমরা করে যাবো। এবং ক্রমান্বয়ে রাজনীতি শিখবো দম্ভ ও গরিমা ত্যাগ ক'রে, যাতে শোধনবাদী ভুলও না হয়, আবার ট্রট্স্কিবাদী খোকামি রোগে না ভুগি।* [১৭]

উৎপল দত্ত পার্টিতে যুক্ত হওয়ার পর তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, পার্টির সঙ্গে যুক্ত হলে তার শিল্পী সত্তা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে না। তাকে সর্বদা পার্টির নির্দেশ মেনে কাজ করতে হবে। আর এই পার্টির নির্দেশে চালিত হলে তার শিল্পী সত্তা, শিল্পীর স্বাধীনতা কোথাও না কোথাও লঙ্ঘিত হবে। এসব অভিযোগের জবাব তিনি দিয়েছেন—

> *কোন দলের নেতৃত্ব স্বীকার করলেই যে— শিল্পী স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে তার স্বাধীন থাকার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। নির্দেশ কোন পার্টিই দেয় না। দেয় রাজনৈতিক লাইন। সে-লাইন সাংস্কৃতিক জগতে প্রয়োগ করার ভার নাট্য দলগুলির। সে-লাইন অনুসরণ না করলে শ্রেণী সংগ্রামে নাটককে সামিলই করা যাবে না।* [১৮]

উৎপল দত্ত এইবারে মার্কসবাদী শিল্প সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে শ্রমিক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি যেহেতু শ্রমিক শ্রেণির পার্টি, তাই শ্রমিকের ভাবনার জগৎ, চেতনার জগৎ-কে বুঝতে গেলে পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলা অপরিহার্য। উৎপল দত্ত এই কাজটি অত্যন্ত সুনিপুণ ও দক্ষতার সঙ্গে করে গিয়েছিলেন। পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে মার্কসবাদী শিল্পীর চেতনা কোনোভাবেই কলুষিত হয় না বরং শ্রমিকদের অন্তরের বেদনা গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায়। পার্টির সংস্পর্শে এসে শিল্পীর মুক্ত চিন্তা, শিল্পীর ধ্যান-ধারণা কলুষিত হয় কিনা, শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি একপেশে ও পক্ষপাত দুষ্ট হয় কিনা সেসব অভিযোগের উত্তরে উৎপল দত্ত বলেন—

শ্রমিক নিজেই এক বিশাল উৎপাদনী প্রক্রিয়ার অংশ, ... সুতরাং সে বিশ্বকে স্থানু ও অচল হিসাবে দেখতে পাবে না, দেখে প্রক্রিয়া হিশেবে। চলমান জগৎ এইভাবে তার চেতনায় প্রবেশ করে...। শ্রমিকের মতাদর্শই তাই সত্যে পৌঁছয়। দার্শনিকদের তথাকথিত নিরপেক্ষ ও শীতল মস্তিষ্ক বিশ্লেষণে জগতের আসল সত্য ধরা পড়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। শ্রমিকের এক পেশে ও জঙ্গী উপলব্ধিতেই বরং জগতকে বোঝা সম্ভব। এবং বুঝে তাকে পরিবর্তিত করাও সম্ভব। [১৯]

পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে শিল্পীর শিল্প স্বাধীনতা খর্বিত হওয়া তো দূরের কথা শিল্পীর ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করতে পার্টি সাহায্য করে। এটা ছিল উৎপল দত্তের অভিমত। শুধু শ্রমিক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করার প্রশ্নই নয়, নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা একান্তভাবেই প্রয়োজন।

উৎপল দত্তের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির ঘনিষ্ট যোগাযোগ থাকলেও তিনি পার্টির প্রতি অন্ধ ছিলেন না। অন্ধ আনুগত্যের সম্পর্ক ছিল না। তিনি একজন স্বাধীন মার্কসবাদী হিসেবে শিল্প সৃষ্টি করেছেন, নিজস্ব ভাবনাচিন্তা অনুযায়ী নাটক, যাত্রা, চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। কখনো কখনো পার্টির চিন্তার সঙ্গে তার চিন্তা হুবহু মিলে গেছে আবার কখনো পার্টির চিন্তার সঙ্গে তার চিন্তার বিস্তর ফারাক পরিলক্ষিত হয়েছে। তার চিন্তার সঙ্গে পার্টির চিন্তা মিলে গেলে সমস্যা ছিল না, কিন্তু যদি তার চিন্তার সঙ্গে পার্টির চিন্তার অমিল হয় তখন তিনি তার প্রতিবাদ করার কথা বলেছেন। উৎপল দত্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—

আমি কোন পার্টির সদস্য নই। আমি যেটা ঠিক বলে মনে করব সেটাই করব।... আমার ভাবনার সঙ্গে (পার্টির ভাবনা) না মিললে নিজেকে আবার বিচার করব, পার্টির মধ্যে থেকেই পার্টির সঙ্গে লড়াই করব। [২০]

তিনি আবার 'স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি থেকে ব্রেখ্‌ট' প্রবন্ধে এসম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেছেন বা এই অভিযোগ খণ্ডন করেছেন।

পার্টি যদি ভুল পথে যায়। যেতেই পারে। সহস্র ভুল করতে পারে। কিন্তু বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন কখনো সামগ্রিকভাবে ভুল পথে যেতে পারে না। যে মার্কসবাদী সে জানে শ্রমিক শ্রেণী সারা বিশ্বে লড়ছে। কমিউনিস্ট পার্টি কোনো একটি দেশে বা অঞ্চলে বা ভাষায় বা জাতিতে সীমাবদ্ধ নয়...। তাই শেষ বিচারে কমিউনিস্ট আন্দোলন সামগ্রিকভাবে সঠিক পথেই থাকে। [২১]

১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দ্বি-খণ্ডিত হওয়ার পর উৎপল দত্ত কমিউনিস্ট পার্টির দক্ষিণপন্থী অংশের রীতিনীতি, কার্যকলাপ, আদর্শ প্রভৃতিকে নিয়ে প্রবল আপত্তি জানান ও বিরোধিতা করেন। দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টদের নিয়ে প্রবল সমালোচনায় জর্জরিত করে তিনি নাটক লেখেন 'একটি তলোয়ারের কাহিনী'। সেখানে তিনি দেখান যে শোধনবাদী কমিউনিস্টরা কীরকমভাবে চালাকির সঙ্গে শ্রেণি পরিবর্তন করেছিল, কীরকমভাবে নির্লজ্জভাবে তারা শাসকশ্রেণির পদলেহন করেছিল ও শ্রমিক, কৃষক শ্রেণির সঙ্গে প্রতারণা করেছিল। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে এই দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টরা একটি নতুন সুবিধাভোগী শ্রেণি হিসেবে সমাজে প্রতিপন্ন হয়েছিল।

কমিউনিস্ট পার্টির দক্ষিণ অংশকে আক্রমণ করার পাশাপাশি বামপন্থীদের সমর্থনে এগিয়ে আসেন উৎপল দত্ত। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে ঘোষণা করা হল যে সিপিআই(এম) গোপনে গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাচ্ছে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে আছে। তাদের দাবি সিপিআই(এম)-এর নানা দফতর তল্লাশি করে অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। তার মধ্যে চিন থেকে আনা কিছু নিষিদ্ধ পাণ্ডুলিপি, যেমন মাও সেতুং ও চে গুয়েভারা-এর লেখা গেরিলা যুদ্ধের প্রবন্ধ। সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণপন্থী অংশ সিপিআইও একই অভিযোগ করেছিল বামপন্থী কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে। সিপিআই(এম) গেরিলা যুদ্ধের অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করল। এর প্রতিবাদ স্বরূপ উৎপল দত্ত একখানা পথনাটক লিখলেন 'গেরিলা'। তিনি দেখালেন কীভাবে অন্যায়ভাবে কেন্দ্রীয় সরকার সিপিআই(এম)-এর উপরে মিথ্যে অভিযোগ এনে তাদেরকে গ্রেফতার করছেন ও তাদের উপরে নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করছে। তিনি দেখালেন প্রগতিশীল নাট্য সংস্থাকে দমন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সবরকম প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তিনি 'গেরিলা' পথনাটকে দেখালেন গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতির যে অভিযোগ কেন্দ্রীয় সরকার করলেন তা নিতান্তই হাস্যকর ও অবাস্তব। কেননা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অভিযোগে যে বইগুলো উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো কোনো গোপনীয় বা নিষিদ্ধ পুস্তক নয়। এই পুস্তকগুলি যখন কলেজস্ট্রিট ও পার্কস্ট্রিটের বিভিন্ন দোকানে বিক্রি হচ্ছে তখন নিষিদ্ধ হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক আরও অভিযোগ করেন ভারতীয় বামপন্থী কমিউনিস্টরা চিনের মদতে ও সাহায্যে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি চালাচ্ছে, এই অভিযোগের জবাবে উৎপল দত্ত স্পষ্ট ভাষায় তার প্রতিবাদ করলেন ও লিখলেন—

> *স্বদেশী শোষকদের থেকে জনতার দৃষ্টি বিদেশি জুজুর দিকে চালিত করা একটি ঐতিহাসিক প্যাঁচ। তার জন্য প্রচারকার্য সর্বগ্রাসী, বিপুল। ... একটি সীমান্ত প্রশ্ন ফুরোতে না ফুরোতে আরেকটি প্রশ্ন তুলতেই হবে। হিটলার-এর শাসননীতির উত্তরসাধক।* [২২]

উৎপল দত্ত বিশ্বাস করতেন সবদেশের মতো ভারতের ইতিহাসও শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস। যুগে যুগে শাসকের অত্যাচার ও শোষিতের প্রতিরোধের ইতিহাস। অথচ তিনি লক্ষ করেন এই বাস্তব ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে শাসক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রচিত বিভিন্ন বিকৃত ইতিহাস পাঠের মধ্য দিয়ে। তিনি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের প্রায় প্রতিটি ঘটনাকে তার শিল্পকর্মের মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কেননা তিনি মনে করতেন সশস্ত্র বিদ্রোহের দীর্ঘ ঐতিহ্য ধরে রাখা দরকার, এবং তাঁর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে বিস্তার করা প্রয়োজন।

তিনি ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে লিখলেন কালজয়ী নাটক 'কল্লোল'। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র নৌবিদ্রোহকে বিষয়বস্তু করে তিনি এই নাটকটি লেখেন। এটি বাংলায় থিয়েটার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় রচনা, এক কালজয়ী রচনা। বিষয়বস্তু, আঙ্গিক ও সামাজিক দিক দিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এই নাটকটি। এই নাটক শাসক শ্রেণি ও তার অনুচরদের রীতিমতো ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। তারা 'কল্লোল'-কে বন্ধ করার জন্য সবরকম প্রচেষ্টা করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। তারা দাবি জানায় যে অবিলম্বে এই নাটক অভিনয় বন্ধ করতে হবে ও এই নাটককে নিষিদ্ধ করতে হবে। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে যেভাবে গুণ্ডাদের হামলায় 'অঙ্গার' নাটকটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল সেভাবেই ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে গুণ্ডাদের আক্রমণে 'কল্লোল' নাটককেও স্তব্ধ করার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৬২ সাল ও ১৯৬৫ সালের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে অনেক পার্থক্য ছিল। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ভারত-চিন সংঘর্ষের বাতাবরণের মধ্যে বামপন্থীদের ওপরে ব্যাপক আক্রমণের ফলে তারা কিছুটা পিছু হটেছিল। স্বাভাবিকভাবে এইসময় তারা মিনার্ভাকে রক্ষা করতে পারেনি কিন্তু 'কল্লোল' অভিনয়ের সময় মিনার্ভাকে রক্ষা করার পুরো দায়িত্ব সিপিআই(এম) নিয়েছিল। সে প্রসঙ্গে উৎপল দত্তের বক্তব্য—

> *১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে সারা দেশে বামপন্থীদের উপর ব্যাপক আক্রমণের সামনে কমিউনিস্ট পার্টি আত্মরক্ষার্থে পিছু হটেছিল সাময়িকভাবে, তাই মিনার্ভাকে রক্ষা করার দায়িত্ব পার্টি নিতে পারেনি। কিন্তু 'কল্লোল'-এর ক্ষেত্রে মিনার্ভাকে রক্ষা করার পুরো দায়িত্ব নিল সিপিআই(এম)।* [২৩]

শাসক শ্রেণি দ্বারা অনেক অত্যাচার, অনেক নির্যাতন করার পরও 'কল্লোল'-কে থামানো গেল না। মিনার্ভা-তে 'কল্লোল'-এর অভিনয় দেখার জন্য দিনের পর দিন দর্শক বৃদ্ধি পেতে লাগল, পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে দিনের পর দিন অভিনীত হতে থাকল 'কল্লোল'। কলকাতার মানুষ ছাড়াও জেলার নানা প্রান্ত থেকে অসংখ্য মানুষ আসছিলেন 'কল্লোল' দেখতে।

> *এমনকি বাসের কনডাক্টররা মিনার্ভার এই জায়গার নাম দিয়ে দিলেন 'কল্লোল স্টপেজ'।* [২৪]

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে হয় সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচন প্রচারের উদ্দেশ্যে উৎপল দত্ত এসময় লিখলেন এক দীর্ঘতম পথনাটক 'দিন বদলের পালা'। নাটকটি অভিনয় করতে প্রায় তিন ঘন্টা সময় লাগত। কিন্তু এত বড়ো হওয়া সত্ত্বেও অভিনয় চলাকালীন দর্শকরা এতটুকুও অমনোযোগী হতে পারতেন না, এমনই ছিল এই নাটকের আকর্ষণ ও অভিনয়। এই নাটকের মধ্য দিয়ে কংগ্রেস সরকারের অন্যায়-অত্যাচার তুলে ধরেছিলেন উৎপল দত্ত। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে বামপন্থীদের রাজনৈতিক প্রচারে এক অন্যতম হাতিয়ার হয়ে ওঠে এই নাটক। তথ্য ও প্রমাণের ব্যাপক প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন তিনি। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করার ব্যাপারে 'দিন বদলের পালা' নাটকটির ব্যাপক প্রভাব ছিল, সেকথা বামপন্থী রাজনৈতিক মহল থেকে স্বীকার করেছিল ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছিল।

রাজনৈতিকভাবে উৎপল দত্ত আজীবন বামপন্থী কমিউনিস্ট মতাদর্শকে লালন-পালন করে গেছেন। কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শ, শ্রেণি-সংগ্রাম, শ্রমিক কৃষকদের আন্দোলন প্রভৃতি তার নিজের আদর্শের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। কিন্তু 'দিন বদলের পালা' নাটকের পর থেকেই উৎপল দত্তের রাজনৈতিক বিচ্যুতি শুরু হয়। তখন সিপিআই(এম)-এর মধ্যে গড়ে উঠেছিল অতি বামপন্থা চরমপন্থী অংশ। যারা অবিলম্বে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটানোর জন্য শপথ গ্রহণ করেছিল। উৎপল দত্ত এই অতি বামপন্থী অংশের সঙ্গে অচিরেই যুক্ত হয়ে পড়লেন।

> *সিপিআই(এম)-এর মধ্যে গজিয়ে উঠেছিল যে অতি— বাম চরমপন্থী চক্র, যারা অবিলম্বে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটানো শপথ গ্রহণ করেছিল, আমি তাদের পক্ষ অবলম্বন করি।* [২৫]

সিপিআই(এম)-এর সাথে উৎপল দত্তের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এই সময়ে দাঁড়িয়ে সেই সম্পর্কে কিছুটা ভাঁটা পড়ে, কিছুটা দূরত্ব তৈরি হয় মতাদর্শগতভাবে। উৎপল দত্তের একটা ধারণা হচ্ছিল যে সিপিআই(এম)-এর বৈপ্লবিক শৌর্য-স্তিমিত হয়ে গেছে। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে সিপিআই(এম)-এর নেতৃত্বে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের সময়ে শরিক হিসেবে সিপিআই ও বাংলা কংগ্রেসকে নেওয়া হল। যারা কিনা কংগ্রেসের তাঁবেদার, যারা কিনা সিপিআই(এম)-এর মতাদর্শের প্রবল শত্রু। অথচ ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনের প্রচারে 'দিন বদলের পালা' নাটকে সিপিআই-কে প্রবলভাবে আক্রমণ করা হয়েছিল ও দেখানো হয়েছিল তারা কংগ্রেসের সহযোগী। নির্বাচনী প্রচারে যারা শত্রু ছিল, নির্বাচনের পরে তারা বন্ধু হয়ে গেল। এ ব্যাপারটা উৎপল দত্তের কাছে অসহ্য লেগেছিল, দ্বিচারিতা মনে হয়েছিল।

উৎপল দত্ত ধীরে ধীরে নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন। নকশালবাড়ি বিদ্রোহ শুরু হয় ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে তখন যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমল। এই সরকারের নির্দেশে

উত্তরবঙ্গের প্রসাদুজোতে নৃশংসগুলি চালানোর ফলে সাত কৃষকরমণী ও দুইজন শিশু নিহত হন। ওই অঞ্চলে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি হয়। উৎপল দত্ত মনে করেছিলেন সরকারে যে-ই থাকুক না কেন, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুখ খুলতে হবে। শোষিত মানুষের প্রতিরোধ উৎপল দত্তের নাটকে সবসময় প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। নাটকের মালমশলা সংগ্রহ করার জন্য তিনি, তাঁর সহকর্মীরা শিলিগুড়ি, নকশালবাড়ি, আলিপুরদুয়ার, প্রসাদুজোতে গিয়ে সেখানে পনেরো দিন ধরে নানা গ্রামে গ্রামে ঘুরে রাজবংশী, গোরখা, বাঙালি মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে, সংগ্রামী কৃষকদের মুখে তাদের অভিজ্ঞতার কথা শুনে উৎপল দত্ত লিখে ফেললেন এক কালজয়ী নাটক 'তীর'।

নকশাল আন্দোলন ক্রমশ বিস্তার লাভ করেছিল। যুক্তফ্রন্ট সরকার বিষয়টি মোটেও সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি। যেহেতু সরকার পক্ষের নির্দেশে প্রসাদুজোতে পুলিশ গুলি চালিয়েছিল যার ফলশ্রুতি 'তীর' নাটকটি। ফলে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ১১ নভেম্বর মধ্যরাতে উৎপল দত্তসহ কয়েকজন নেতার নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়। 'তীর' নাটক মঞ্চস্থ করার বিষয়ে 'লিটল থিয়েটার'-এর অনেকেই উৎপল দত্তের সঙ্গে একমত ছিলেন না। অনেকে নকশালবাড়ি আন্দোলন সম্পর্কে উৎপল দত্তের সরাসরি যোগাযোগ ও তার অতি আগ্রহকে সংযত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অনেকে উৎপল দত্তকে আরও গভীরভাবে বিষয়টিকে নিয়ে গভীরভাবে ভেবে দেখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। যদিও পরে এই মতপার্থক্য ঘুচে যায়। উৎপল দত্ত এ বিষয়ে বলেছিলেন—

> *কিন্তু 'তীর' নাটক একান্তভাবে জোতদারের অত্যাচার, কৃষকের প্রতিরোধ ও পুলিশের জুলুমে আবদ্ধ থাকায় সেটা মঞ্চস্থ করতে সকলে সহযোগিতা করেছিলেন।* [২৬]

ইতিমধ্যে উৎপল দত্ত জেমস আইভরি-র 'দা গুরু' ছবিতে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। এই ছবিতে অভিনয় করার বিষয়ে কিছু কিছু নকশাল নেতা আপত্তি তোলেন। তাদের আপত্তি ছিল একজন নকশাল হয়েও আমেরিকান ফিল্ম কোম্পানির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করা যায় না, কারণ আমেরিকা দুনিয়ার পয়লা নম্বর শত্রু। পরে নকশাল নেতারা উৎপল দত্তকে এই ছবিতে অভিনয় করতে সরাসরি নিষেধ করেন। নকশালরা দাবি করেন—

> *Theatre করা মানে সময় নষ্ট। Theatre করা মানে বিপ্লব থেকে পালিয়ে থাকা। Theatre করবে, তাছাড়া এসবও করতে হবে। তা না হলে তো বিপ্লবী পরিচয় থাকছে না।* [২৭]

নকশাল রাজনীতির সঙ্গে উৎপল দত্তের দূরত্ব তৈরি হচ্ছিল এবং তা ক্রমেই বাড়ছিল। রাজনীতিতে নকশালদের অতি বাম বিচ্যুতির সঙ্গে এল সাংস্কৃতিক জগতে স্বৈরাচারী কাণ্ডকারখানা। প্রায় সব

মনীষীদের মুণ্ডুপাত করা হচ্ছিল, অবমূল্যায়ন করা হচ্ছিল, মূর্তি ভাঙা হচ্ছিল। উৎপল দত্ত মন থেকে একেবারে মেনে নিতে পারেননি। এ বিষয়ে উৎপল দত্ত বলেছেন,

> *প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের বিশ্লেষণ না ক'রে শুধু খিস্তি করলে বিপ্লবী সংস্কৃতির মূলোচ্ছেদ হয় জনমন থেকে, এসে জুড়ে বসে শাসকশ্রেণীর অপসংস্কৃতি।* [২৮]

নকশালদের বিভিন্ন কার্যকলাপ ও তাদের বিভিন্ন মতাদর্শ উৎপল দত্ত কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিলেন না। ফলে নকশাল রাজনীতির সঙ্গে উৎপল দত্তর দূরত্ব যখন বাড়ছিল তখন সিপিআই(এম)-এর রাজনীতি সম্পর্কে তিনি পুনর্বিবেচনা করতে শুরু করেছিলেন। নানা ঘটনা পরম্পরা ও বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের মধ্যে উৎপল দত্ত নিজেকে আত্মসমালোচনার দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন। তিনি ভাবতে শুরু করেছিলেন 'তীর' নাটকটি লিখে তিনি হয়তো ভুল শ্রেণি সংগ্রামের পক্ষে চলেছেন, ঔদ্ধত্যের কারণে নিজের ভুল নিজে স্বীকার করতে চাইছিলেন না। শেষমেষ তার আত্মোপলব্ধি ঘটে যে বাস্তবিকভাবে সিপিআই(এম)-ই শহরের সব ধর্মঘটগুলি ও কৃষক আন্দোলনগুলির নেতৃত্ব দিয়েছিল। তিনি বুঝতে পারেন ইন্দিরা গান্ধির ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল সিপিআই(এম)। সিপিআই(এম)-ই ছিল দেশের সব প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণের লক্ষ্য। এই আত্মোপলব্ধিতে পৌঁছানোর পরে উৎপল দত্ত তার 'তীর' নাটকটি বন্ধ করে দেন এবং সিপিআই(এম)-এর মতাদর্শের সঙ্গে তার নিজের মতাদর্শকে মিলিয়ে চলতে থাকেন।

কংগ্রেসি আমলে যখন সিপিআই(এম)-এর উপরে নানা রকমের অত্যাচর নানা অন্যায় অবিচার নেমে এসেছে উৎপল দত্ত-এর কলম তখনই সচল হয়েছে। সেসব ঘটনার প্রতিবাদে অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি লিখেছেন কালজয়ী সব নাটক। ঠিক বিপরীত দিক থেকে একই রকমভাবে যখনই উৎপল দত্তের নাটকের উপর নানা রকম অত্যাচার নানা রকম হামলা করতে বিরোধীরা কংগ্রেসরা উদ্যত হয়েছে তখনই তা প্রতিহত করতে সিপিআই(এম) সবার আগে এগিয়ে এসেছে, তারা প্রাণপণ দিয়ে রক্ষা করেছে মিনার্ভা থিয়েটারকে তথা উৎপল দত্তের নাটককে।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনের ঠিক আগে বামপন্থী নেতা হেমন্ত বসুকে হত্যা করে কিছু অজ্ঞাতপরিচয় লোক। কংগ্রেসিরা চক্রান্ত করে পুলিশি তদন্তের আগেই চিৎকার শুরু করে দেন এই খুনের জন্য সিপিআই(এম) দায়ী এবং এদের সঙ্গে গলা মেলান স্বার্থপর বুদ্ধিজীবীদের একাংশ। হেমন্ত বসুর হত্যার সমস্ত দায় সিপিআই(এম)-এর উপরে চাপিয়ে দিয়ে তাদের উপর

চলল অকথ্য অত্যাচার, নির্যাতন ও ধড়পাকড়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে সিপিআই(এম) পশ্চিমবঙ্গে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। এরপর ক্ষমতা দখলের জন্য ব্যাপক রিগিং ছাড়া কংগ্রেসের সামনে আর কোনো রাস্তা খোলা থাকল না। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে তারা গুলি চালিয়ে, বোমা মেরে, ভোটারদের ভয় দেখিয়ে তারা বুথ থেকে তাড়িয়ে দিল। তারা বুথ দখল করল, বন্দুক উঁচিয়ে ব্যালট বাক্স ভর্তি করল ব্যালট পেপারে এইসব ঘটেছিল একেবারে প্রকাশ্যে দিবালোকে এবং সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে বুদ্ধিজীবীদের তরফ থেকে কোনো রকম প্রতিবাদ দেখা যায়নি। সিপিআই(এম)-এর উপর অকথ্য অত্যাচার, একজন সিপিআই(এম) সদস্যকেও তারা বাড়ি থাকতে দিচ্ছে না। কেউ কর্মক্ষেত্রে যেতে পারছে না, সবাইকে ধরে ধরে জেলে ভরা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র অরাজকতা চলছে। এরকম পরিস্থিতিতে উৎপল দত্ত প্রতিবাদ স্বরূপ প্রচণ্ড ক্রোধে লিখে ফেললেন 'ব্যারিকেড' নাটকটি।

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে উৎপল দত্ত লিখলেন এক কালজয়ী নাটক 'দুঃস্বপ্নের নগরী'। এই নাটকে ১৯৭১-৭৪ সালের পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সন্ত্রাসের এক দলিল বলা যেতে পারে। এই নাটক প্রথম থেকেই ভাড়াটিয়া গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে বারে বারে, পুলিশি নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে অসংখ্যবার। এমনকি, এই নাটক বন্ধ করতে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলাও করা হয়।

> *আমাদের 'দুঃস্বপ্নের নগরী' তখন বে-আইনি হল; শুধু বে-আইনি হল না, প্রহার ও হল; যেখানে অভিনয় করতে যাচ্ছি সেখানেই প্রহার।* [২৯]

ভাড়াটে গুণ্ডা ও পুলিশের অত্যাচারে 'দুঃস্বপ্নের নগরী'কে থামানো গেল না। যখন নাটকের উপরে অত্যাচার করার প্রচেষ্টা হয়েছে তখন সিপিআই(এম)-এর সদস্যরা এগিয়ে এসেছে নাটকটিকে রক্ষা করতে। উৎপল দত্তের কথায়—

> *আমাদের পরবর্তী শো ছিল দক্ষিণ কলকাতার একটি থিয়েটারে, এবং যথারীতি দক্ষিণ কলকাতার সিপিআই(এম)-এর সদস্যরা এগিয়ে এলেন নাটকটিকে রক্ষা করতে।... আমার ডায়েরী বলছে নাটকটি অন্তত চৌদ্দবার আক্রান্ত হয়েছিল, যার মধ্যে তেরোটি ক্ষেত্রে গুণ্ডার দলকে প্রতিহত করেছিল কমিউনিস্ট প্রহরীরা।* [৩০]

উৎপল দত্ত তার নাটকে বারে বারে ভারতের অতীত ইতিহাসের নানা পর্বকে তুলে ধরেছিলেন, ভারতবাসীর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের নানা অধ্যায়কে ভারতবাসীর সামনে নতুন করে উপস্থাপিত করেছেন। সেইসমস্ত সংগ্রামকে মার্কসবাদী আলোকে ও মার্কসবাদী

চিন্তাধারায় বিচার করেছিলেন। তাঁর এই কাজের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের জনগণের বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের সঙ্গে আজকের কমিউনিস্টদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের অন্তর্নিহিত যোগসূত্রটাকে উন্মোচন করা। তিনি তার নাটকে বারে বারে মার্কসবাদী ভাবধারা, চিন্তা চেতনা ও মতাদর্শকে তুলে ধরেছেন। এক সাক্ষাৎকারে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় উৎপল দত্তকে প্রশ্ন করেছিলেন— ''অতীত ইতিহাসের একটা Period নেওয়া এবং সেটাকে closely project করা''— এটা আপনাকে বারে বারে আকর্ষণ করে কেন? উৎপল দত্ত সুন্দরভাবে জবাব দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন :

> *মার্কসবাদী দৃষ্টিতে ইতিহাসকে না দেখলে মার্কসবাদী দৃষ্টিতে বর্তমানকেও দেখা যায় না। এটা আমরা বিশ্বাস করি, এবং নাটকের একটা অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে অতীতকে সঠিকভাবে মার্কসবাদী আলোকে তুলে ধরা। কেননা, আগের সমস্ত বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানেরই ঐতিহ্য বহন করছে আজকের কমিউনিস্টরা। কমিউনিস্টরা কোনও ভুঁইফোড় শক্তি নয়। তারা পৃথিবীতে যত বিপ্লব আগে হয়ে গেছে, অভ্যুত্থান যত ঘটে গেছে— যে সমস্ত ঐতিহ্যের তারা হচ্ছে উত্তরসূরী।* [৩১]

রাজনৈতিক ভাঙাগড়ার ইতিবৃত্তে উৎপল দত্তের পথনাটক

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় গণনাট্য সংঘে যোগদান করার পর উৎপল দত্ত পথনাটকের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তাঁকে বাংলা পথনাটকের অগ্রণী পথিকৃত বলা যেতে পারে। বাংলা রাজনৈতিক থিয়েটারে নাটক রচনা ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে উৎপল দত্ত যুগ স্রষ্টা। মার্কসবাদী দর্শনে বিশ্বাসী উৎপল দত্তের কাছে পথনাটক ছিল সরাসরি জনতাকে রাজনৈতিক চেতনায় শিক্ষিত উদ্বুদ্ধ করার হাতিয়ার। তিনি প্রতিটি নির্বাচনেই কমিউনিস্ট পার্টির প্রচারে পথনায়ককে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। নির্বাচন ছাড়াও কারখানার গেটে ধর্মঘটি শ্রমিকদের সমর্থনে পথনাটক অভিনয় করেছেন। রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড নিয়ে নাটক করেছেন, শিক্ষক আন্দোলন নিয়ে নাটক করেছেন, সত্তর দশকের উত্তাল কলকাতাকে নিয়ে পথনাটক করেছেন, নানা রাজনৈতিক বিষয় ও শোষিত বাংলার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর প্রচারে পথনাটক করেছেন। সমসাময়িক সময়ে প্রতিটি রাজনৈতিক ঘটনাবলি তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুধাবন করেছেন ও সেগুলিকে নাটকের মধ্যে অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। শাসকের অত্যাচার, শ্রমিক মজদুর শ্রেণির প্রতি তাদের অসহযোগিতা, শোষণ, নিপীড়ন প্রভৃতি পথনাটকের মধ্য দিয়ে তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে তার প্রথম পথনাটক 'পাসপোর্ট' এবং ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে তার শেষ পথনাটক 'সত্তরের দশক'। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি গুরুত্বপূর্ণ পঁচিশটি পথনাটক আমাদের

উপহার দিয়েছেন। যার প্রায় প্রতিটি সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলি নিযে রচিত। দশটা রাজনৈতিক বক্তৃতায় যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, তার থেকে অনেক বেশি আলোড়ন তুলতে পারে একটি পথনাটক— একথা উৎপল দত্ত বারে বারে প্রমাণ করেছেন। পথনাটক সম্পর্কে গণনাট্য সংঘে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তা তিনি 'এপিক থিয়েটার' পত্রিকায় সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। উৎপল দত্ত বলেছেন—

> *৫১ সালে শুরু হোলো বন্দীমুক্তি আন্দোলন। চারদিকে সমাবেশ আর মিছিল।... পানুপাল প্রস্তাব তুললেন...। পথনাটিকা চাই। ... পানু পাল উমানাথ ভট্টাচার্যকে বললেন, তক্ষুণি বসে বন্দীমুক্তি সম্পর্কে নাটক লিখতে। উমানাথ লিখলো, 'চার্জশীট'—একরাত্রে।* [৩২]

উৎপল দত্ত ও তার সহকর্মীরা কখনো রাত জেগে কখনো বহু কাজের ফাঁকে পথনাটক রচনা করেছেন। তারা কখনো কখনো সারারাত ধরে মহড়া করেছেন। আবার এমনও হয়েছে নাটক রচনা করার পর সঙ্গে সঙ্গে মহলা করেছেন। আবার এমনও হয়েছে নাটক রচনা করার পর সঙ্গে সঙ্গে মড়ালা করা ও মড়ালা করে সরাসরি মঞ্চে উঠতে হয়েছে অভিনয় করার জন্য। এতবেশি সংখ্যক তারা পথনাটক করতেন যে, তাদের হিসেব ছিল না, কখন, কোথায়, কোন নাটক অভিনয় হয়েছিল, কী পরিস্থিতিতে হয়েছিল।

> *বিকেল পাঁচটায় মহলা থেকে সোজা হাজরা পার্কে এবং বক্তৃতার মঞ্চে উঠলাম ৮-টা নাগাদ অভিনয় করতে। কখনো হিসেব করিনি কোন কোন পথনাটিকার কত অভিনয় হয়েছিল। অসংখ্য। জলপাইগুড়ি থেকে ক্যানিং। হাটে-বাজারে। লরির উপরে। রোয়াকে।* [৩৩]

শ্রমজীবী, মেহনতি সাধারণ মানুষকে তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে সচেতন করে তোলার জন্য নাট্য শিল্পীদের নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করতে হয়েছে। মেহনতি মানুষের জীবনের বাস্তব তাগিদেই পথনাটকের উদ্ভব হয়েছে। মূলত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিয়েই পথনাটক পথে-পথে, শহর থেকে গ্রাম-গঞ্জে অভিনয় করে চলে। উৎপল দত্ত ছিলেন মার্কসবাদী আদর্শে বিশ্বাসী ও রাজনীতি ছিল মার্কসবাদের রাজনীতি। সমাজ-শোষণ ও রাজনৈতিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে জাগ্রত জনতার সমবেত ও প্রতিরোধ ও সংগ্রামের রাজনীতি। বলা যায়, পথনাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল রাজনৈতিক বক্তব্য— একথা উৎপল দত্ত মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন।

উৎপল দত্ত রাজনৈতিক বক্তব্যগুলি পথনাটকের মধ্যে যাতে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় এবং মানুষের কাছে সহজে পৌঁছে দেওয়া যায় তার জন্য তিনি তৎকালীন বা তার সমসাময়িক

বাংলা তথা ভারতবর্ষে ঘটে যাওয়া বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক ঘটনাবলি সুকৌশলে নিপুণতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কে মেহনতি শ্রমজীবী মানুষকে সচেতন করেছেন, তাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন, অন্যায় শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদী ও সচেতন করে তুলেছেন।

উৎপল দত্তের প্রথম পথনাটকের নাম 'পাসপোর্ট' (১৯৫১)। একটি বিশেষ বিষয়কে সামনে রেখে লেখা হয়েছিল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলা ভাগ হয়ে পূর্ব ও পশ্চিমবাংলা দুটো আলাদা দেশের অন্তর্গত হয়েছিল। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের পর এই দুই দেশের মানুষের এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে গেলে পাসপোর্ট লাগবে বলে আইন ঘোষিত হয়েছিল যা বাংলা ও বাঙালির কাছে অনভিপ্রেত। অনেকেই নিজের দেশ ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে চলে এসেছিল পশ্চিমবঙ্গে। পাসপোর্ট প্রথা তাদের যাতায়াতের পথে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে প্রতিভাত হয়। সেদিন বাঙালি তথা ভারতবর্ষের অনেকেই এই পাসপোর্ট প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র বিরোধিতা করেছিল। 'পাসপোর্ট' নাটকটি এই বিরোধীদের পক্ষে একটি প্রচার মূলক নাটক।

১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি লেখেন 'নয়া তুঘলঘ'। এই পথনাটক এক বিশেষ রাজনৈতিক বিষয়কে ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল। ভারতবর্ষ প্রজাতন্ত্র দেশ হিসেবে ঘোষিত হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধানচন্দ্র রায় এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর পারস্পরিক বোঝাপড়া বাংলা বিহার প্রদেশের সংযুক্তির প্রস্তাব নিয়ে আসেন। কংগ্রেসের এই রাজনৈতিক প্রস্তাব সে সময় বাঙালির কাছে আত্মহত্যার শামিল বলে মনে হয়েছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করা শুরু করেন এবং কংগ্রেসের রাজনৈতিক চক্রান্ত মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হন। জনমানসে তৈরি হওয়া এই তীব্র প্রতিক্রিয়া ও বিভিন্ন সংগঠনের মোকাবিলার পটভূমিতেই উৎপল দত্ত 'নয়া তুঘলক' পথনাটিকাটি রচনা করেন।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে উৎপল দত্ত লিখলেন 'স্পেশাল ট্রেন' ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে। হুগলি জেলার হিন্দ মোটর কারখানায় প্রায় ছয় হাজার শ্রমিক বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে তারা ধর্মঘট করে। মালিকপক্ষ মুনাফা হারানোর ভয়ে এই ধর্মঘটকে বানচাল করার জন্য সমস্ত প্রকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। ভয় দেখিয়ে, লোভ দেখিয়ে, বরখাস্তের হুমকি দিয়েও তাদেরকে দমিয়ে রাখা গেল না। পুলিশ দিয়ে নানা অত্যাচার করে, ধর্মঘটে শ্রমিকদের ক্যাম্প অফিস লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে, তাদের উপর নানা রকম অত্যাচার করেও ধর্মঘট উঠানো গেল না। হাওড়া-ব্যান্ডেল ট্রেন লাইনে হিন্দ মোটর একটি হল্ট স্টেশন ছিল। সেখানে সব গাড়ি দাঁড়ায় না। বিড়লাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কংগ্রেস সরকার বিশেষ অনুমতি দিল যাতে হিন্দ মোটর হল্ট স্টেশনে বাড়তি অনেক

ট্রেন দাঁড়ায়। সেইসব ট্রেনে করে বাইরে থেকে প্রচুর গুণ্ডা নিয়ে এসে ধর্মঘটিদের উপরে অত্যাচার শুরু হল যাতে কারখানাটাকে চালু রাখা যায়। এই পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে উৎপল দত্ত 'স্পেশাল ট্রেন' নাটিকাটি রচনা করেন। উৎপল দত্তের কথায়—

> *৬১-এর ডিসেম্বরে উত্তর পাড়ায় হিন্দমোটরস কারখানায় ধর্মঘটে বিড়লা-র সেবায় স্পেশাল ট্রেন নিয়োজিত হল। ট্রেন বোঝাই বেকার, গুণ্ডা দালাল উত্তর পাড়ায় গিয়ে নেমেছিল ধর্মঘট ভাঙবার জন্য এবং ধর্মঘটি শ্রমিকদের প্রবল মারে দিশেহারা হয়ে তারা প্ল্যাটফর্ম থেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। সরেজমিনে গিয়ে আমরা নাটিকা তৈরী করলাম 'স্পেশাল ট্রেন' এবং সেটি অভিনয় করতে লাগলাম বহু জায়গায়।* [৩৪]

১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দ্বি-খণ্ডিত হয়ে সিপিআই(এম) গঠিত হল। এইসময় সিপিআই(এম)-কে দমন করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির দক্ষিণপন্থী অংশ ও কংগ্রেস নেতৃত্ববৃন্দ সদাসর্বদা প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। ভারতের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুরজালি লাল নন্দ ঘোষণা করেছিলেন যে, সিপিআই(এম) গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাচ্ছে, সে বিষয়ে তাদের হাতে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক বিবৃতি দিয়ে দাবি করেন সিপিআই(এম)-এর নানা দফতর খানা তল্লাশি করার পর তাদের হাতে কিছু গোপন পাণ্ডুলিপি এসেছে যেগুলো চিন থেকে আগত এবং যার লেখক মাও সেতুং ও চে গুয়েভারা। ফলস্বরূপ বামপন্থী কর্মীদের উপরে অত্যাচার ও ধড়পাকড় শুরু হয়।

> *নেতৃত্ববৃন্দ পুনরায় গ্রেপ্তার হন, এবং সদ্যজাত সংসদনবাদী পার্টি ইতরের মতোন প্রগতিশীল নাট্যসংস্থাকে দমন করবার জন্য শাসক শ্রেণীকে উপদেশ দিতে থাকলো।* [৩৫]

কমিউনিস্ট পার্টির দক্ষিণপন্থী অংশের বিশ্বাসঘাতকতা এবং তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদে উৎপল দত্ত 'গেরিলা' (১৯৬৪) পথনাটিকা রচনা করলেন।

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের পশ্চিমবঙ্গের ভয়াবহ খাদ্যসংকটের পরিস্থিতিতে উৎপল দত্ত 'সমাজতান্ত্রিক চাল' পথনাটিকাটি রচনা করেন। নাটিকাটি প্রথম অভিনীত হয় ১৯৬৫-এর আগস্ট মাসে। বছরের প্রথম থেকেই পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে-গঞ্জে খাদ্যসংকট এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল। দিনে দিনে চালের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে, খাদ্যভাবের এই দুর্দিনে মানুষ অনাহারে মরে যেতে লাগলো। খিদের জ্বালায় মা তার সন্তানকে হত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে অথচ মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন রাজ্যে অনাহারের কোনো সংবাদ নেই। এইরকম একটা খাদ্য সংকট, না খেতে পাওয়া মানুষের হাহাকার, আর্তনাদ ও দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে

উৎপল দত্ত রচনা করলেন 'সমাজতান্ত্রিক চাল'। ১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসে প্রথম অভিনয় হয় এবং ওই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে উৎপল দত্ত এবং এই নাটকের প্রকাশক জোছন দস্তিদার গ্রেফতার হন।

অবশেষে ৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে আমি বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হই। [৩৬]

উৎপল দত্তের গ্রেফতারের কারণে নাটকটি দশ বারের বেশি অভিনয় করা সম্ভব হয়নি। স্বাধীন ভারতে এই প্রথম কোনো নাট্যকার ও পরিচালককে 'ভারত রক্ষা আইনে' কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। দেশে খাদ্যাভাব, কমিউনিস্ট পার্টির উপরে কংগ্রেস সরকারের অত্যাচার, ভারত-চিন সীমান্ত সংঘর্ষ, কমিউনিস্ট পার্টির দ্বি-বিভক্ত হওয়া এবং মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি গঠন— দেশ ও পার্টির এই সময়ে উৎপল দত্ত 'সমাজতান্ত্রিক চাল' নাটকটি রচনা করেছিলেন।

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনের প্রাককালে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান ও চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে লেখেন 'দিন বদলের পালা' নাটিকাটি। এই নাটক উক্ত নির্বাচনে বামপন্থীদের রাজনৈতিক প্রচারের এক আশ্চর্য হাতিয়ার। এই নাটকে ব্যাপক প্রামাণ্য তথ্যের প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন উৎপল দত্ত। তাঁর কোনো যুক্তি তথ্য হীন ছিল না। খাদ্য আন্দোলনের সময় এক যুবক পুলিশ অফিসারকে খুন করে বলে অভিযোগ এবং সেই অভিযুক্তকে আদালতে বিচার করা— কাহিনি বলতে এটুকুই। নাটিকাটিতে সেই সময়কার রাজনৈতিক প্রেক্ষিত ও তার বিচার বিশ্লেষণ, কংগ্রেস ও সিপিআই-এর গোপন আঁতাত প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরেছেন।

> *শোধনবাদীদের নির্বাচনী ইস্তাহার উদ্ধৃত করে দেখাতাম তারা আসলে কংগ্রেসের বি-টিম, এবং সাম্প্রতিক খাদ্য আন্দোলনের কারণ, প্রফুল্ল সেন মন্ত্রীসভার জালিয়াতি ও প্রবল অত্যাচারের খতিয়ান হাজির করতাম।* [৩৭]

দেশের পথনাটকের ইতিহাসে এই নাট্য প্রযোজনা এক অনন্য দৃষ্টান্ত। প্রথমে এই নাটিকাটি অভিনয় করতে সময় লাগত দেড় ঘণ্টা কিন্তু পরবর্তীকালে এই নাটক শেষ করতে সময় লাগে আড়াই থেকে তিনঘণ্টা। রাজ্যের নির্বাচনী ক্ষেত্রে এক ব্যাপক গণচেতনা ও গণআন্দোলনের জোয়ার নিয়ে এসেছিল। মিনার্ভাতে 'কল্লোল' ও 'অজেয় ভিয়েতনাম' নাটকের প্রভূত খ্যাতির মধ্যেও এই নাটক দিনে চারবার পর্যন্ত অভিনীত হয়েছে। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে রাজ্যে কংগ্রেস সরকারের পতন হয়ে দিনবদল হল, ক্ষমতা দখল করল প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার।

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে আবার সন্ত্রাস ও নানা অত্যাচার ও নিপীড়নের মধ্য দিয়ে কংগ্রেস দল পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা লাভ করে। বামপন্থীরা এই নির্বাচনের প্রতিবাদ জানায় এবং বিধানসভার

মধ্যে ও বাইরে অবস্থান বিক্ষোভ করে ও অন্যান্য প্রশাসনিক কাজ বয়কট করে। ক্ষমতা দখল করার পর কংগ্রেস দল এমন একটা রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও বিভীষিকা তৈরি করে যাতে সবরকমের বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যায়। তারা যেন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। হত্যা, নির্যাতন, ঘরছাড়া, জেলে বন্দি, বিনা বিচারে আটক ও নির্বিচারে গুলি চালনা প্রভৃতি চলতে থাকল। পুলিশ প্রশাসন ও আধাসামরিক বাহিনীর দ্বারা কংগ্রেস সরকার বাংলার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা একেবারে তছনছ করে দিয়েছিল। সত্তর দশকের সন্ত্রাস ও রক্তস্নানের এই অস্থির সময়কে কেন্দ্র করে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে উৎপল দত্ত লেখেন সাড়া জাগানো পথনাটক 'বর্গী এল দেশে'।

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে উৎপল দত্ত লিখলেন দিন বদলের 'দ্বিতীয় পালা'। প্রথম পালার দশ বছর পরে দ্বিতীয় পালা লিখলেন, দুটি পালা-ই অপশাসনের হাত থেকে বাংলাকে মুক্তির পালা। পুলিশ-প্রশাসন এবং কংগ্রেস দলের মিলিত প্রচেষ্টায় সেদিন কী বীভৎস ভয়ংকর সন্ত্রাস পশ্চিমবঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিল তার জীবন্ত ও বাস্তব চিত্র এঁকেছেন এই পথনাটকে। শুধু অত্যাচার, শুধু সন্ত্রাস, বা শুধু নিপীড়নের ছবি এই দ্বিতীয় পালা নয়। শত অত্যাচারের শেষে এই অত্যাচারিত, নিপীড়িত ও শোষিত মানুষরাই শেষ কথা বলবে— তারই একটি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে এই পথনাটিকাতে। এই নাটকটি পূর্বে অভিনীত উৎপল দত্তের 'বর্গী এল দেশে' পথনাটকের সংক্ষিপ্ত ও ন্যূনতম রূপ। এই নাটক দেখতে দেখতে জনতা যেমন সদ্য ফেলে আসা অতীতকে দেখতে পেত, কংগ্রেস সরকারের অত্যাচারের স্বরূপকে জানতে পারত তেমনি ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে অত্যাচারীর মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হতে পারত। এই নাটকটি অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে পিএলটি নাট্য দল এবং উৎপল দত্ত পশ্চিবঙ্গের নানা প্রান্তে ও নানা দিকে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। তারা প্রচার করেছিলেন সাধারণ মানুষের নেতৃত্বেই পশ্চিমবঙ্গে পালা বদল ঘটবে। ১৯৭৭-এর নির্বাচনের ফলাফল সেকথা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল। ভারতবর্ষের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো একসঙ্গে মিলে কংগ্রেসকে পরাজিত করে জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে গড়ে উঠল বামফ্রন্ট সরকার।

১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে নির্বাচনী পটভূমিকায় উৎপল দত্ত লিখলেন 'কালো হাত' নামক একটি পথনাটিকা। সত্তর-এর দশকে প্রবীণ জননেতা হেমন্তকুমার বসুকে হত্যা করেছিল অজ্ঞাত পরিচয় কিছু দুষ্কৃতি। কিন্তু কংগ্রেস সুকৌশলে তার দায়ভার বামপন্থীদের উপরে চাপিয়ে দিয়ে তাদের উপরে পুলিশি নির্যাতন শুরু করল। বামপন্থীদের উপর এই মিথ্যা দোষারোপ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি লিখলেন 'কালো হাত'

পথনাটিকাটি। এই আলোড়ন সৃষ্টিকারী পথনাটক রাজ্যের সর্বত্র সাড়া জাগিয়েছিল। আদালত দৃশ্যের আঙ্গিকে নির্মিত এই প্রবল রাজনৈতিক বার্তায় বলিষ্ঠ পথনাটক উৎপল দত্তের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা।

সমকালীন কোনো রাজনৈতিক ঘটনাই উৎপল দত্তের নজর এড়ায়নি। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ৫ জুলাই মালদহ জেলার রতুয়া অঞ্চলে মালো বা জেলে পাড়ার এক পৈশাচিক হত্যা লীলার খবরে সারা দেশে প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। এই পৈশাচিক নারকীয় হত্যাকাণ্ডে তেরো জন সিপিআই(এম) কর্মী নিহত হন। মালো পাড়ায় ঘরবাড়ি পুড়িয়ে, বৃদ্ধ, শিশু ও নারীর উপরে অবাধে সকলের উপর অত্যাচার করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডকে বিষয় করে উৎপল দত্ত লিখলেন 'মালো পাড়ার মা' নাটিকাটি। নাট্যকার নিজে মালদহে গিয়ে সরেজমিনে সবকিছু দেখে, প্রত্যক্ষদর্শীদের ইন্টারভিউ নিয়ে, নিহতদের আত্মীয়দের সঙ্গে কথা বলে, বাস্তব তথ্যের উপরে ভিত্তি করেই এই নাটক লিখেছিলেন। নাটককে কীভাবে শ্রেণি-সংগ্রামে শামিল করতে হয়। তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ ছিল এই নাটক। এই নাটক সম্পর্কে উৎপল দত্ত তার বিখ্যাত 'জপেন দা জপেন যা' প্রবন্ধে লিখেছেন—

> *বিপ্লবী ভবিষ্যতটা খুব সংযতভাবে চাপাস্বরে উচ্চারণ করে সূত্রধার— অখ্যাত মালো পাড়াকে নিকারোগুয়া, এল সালভাদর-এর সঙ্গে যুক্ত করে দেয়। ব্যাপারটা একি। ওরা এসে মেরে গেল, সেখানেই ঘটনা শেষ নয়, একরকম শুরু বলা যায়। রাজনৈতিক নাটক শেষ যবনিকায় শেষ হয় না, একটা অসমাপ্তির রেশ থেকে যায়। কারণ ইতিহাসের সমাপ্তি নেই।* ৩৮

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি নিহত হলেন ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে ৩১ অক্টোবর। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁরই পুত্র রাজীব গান্ধি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এইসময় কেন্দ্র সরকারের কার্যকলাপ, অপদার্থতা, ভুল-নীতি নিয়ে তীব্র ব্যঙ্গ ও শ্লেষের মধ্য দিয়ে দুটি নাটক লেখেন— 'মুমূর্ষু বাংলা' (১৯৮৫) এবং 'মুমূর্ষ নগরী' (১৯৮৫)। এই সময় এই দুটি পথ নাটক বাংলা ও বাঙালিকে কিছুকাল যাবৎ মাতিয়ে দিয়েছিল। 'মুমূর্ষু বাংলা' পথনাটিকাটি মূলত তৈরি হয়েছিল বোলপুরের উপনির্বাচন উপলক্ষ্যে। সেখানকার সিপিআই(এম) প্রার্থী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়-এর সমর্থনে ও প্রচারে এক বিশেষ গুরুতপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এই পথনাটিকাটি। 'মুমূর্ষু বাংলা' ও 'মুমূর্ষ নগরী' দুটি পথ নাটকেই তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। তীব্র ব্যঙ্গ, কৌতুক ও শ্লেষের মধ্য দিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি ও তার কংগ্রেসি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেছেন।

১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে 'কাঁচের ঘর' নামক আর একটি পথনাটিকার প্রযোজনা করেন। এটি মূলত ঐ বছরের সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষ্যে রচিত। এ নাটকটিতেও কংগ্রেস সরকারের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রবল সমালোচনা করা হয়েছে এবং তীব্র ভাষায় আক্রমণ করা হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের নির্বাচনী প্রচারে যেমন সহায়তা করেছিল তেমনি এক বিশেষ হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল 'কাঁচের ঘর' পথনাটিকাটি।

১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে লেখেন 'হমে দেখনা হ্যায়' পথনাটিকাটি। 'বাঙালির বাচ্চা' নাম নিয়ে কখনো কখনো অভিনীত হয়েছে কলকাতার বিভিন্ন স্থানে। আলোচ্য নাটকটিতে একই রকমভাবে কংগ্রেস সরকারকে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা হয়েছিল। এইসময় রাজীব গান্ধি ভারতের প্রধানমন্ত্রী। মায়ের মৃত্যুর পর পাইলটের চাকরি ছেড়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। তিনি ভালো বক্তৃতা দিতে পারতেন না বিশেষ করে হিন্দি ভাষায় একেবারে সাবলীল ছিলেন না। তিনি হিন্দি ভাষায় যখন বক্তৃতা করতেন তখন প্রায়ই বলতেন 'হমে দেখনা হ্যায়'। রাজীব গান্ধির এই কথা বলার ধরনকে ব্যঙ্গ করে উৎপল দত্ত এই পথনাটকটি রচনা করেছিলেন। তিনি কংগ্রেস সরকারের অপদার্থতা, রাজীব গান্ধির অপদার্থতা ও ফাঁকা আওয়াজকে তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন। রাজীব গান্ধির কথা বলার রীতিকে ব্যঙ্গ করতে করতে উৎপল দত্ত প্রকৃতপক্ষে সরকারকেই ব্যঙ্গ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন দেশ শাসনের নামে ভণ্ডামির চূড়ান্ত রূপ। ব্যক্তির অপদার্থতাকে দেশ শাসনের অপদার্থতার বৃহৎ পরিধিতে বিস্তারিত করে দিয়েছেন তিনি।

১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে উৎপল দত্ত রচনা করেন তাঁর শেষ পথনাটক 'সত্তরের দশক'। এটি ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে রচিত। তিনি কুড়ি বাইশ বছর আগেকার সত্তরের দশকের কংগ্রেস সরকারের অত্যাচার, শোষণ ও ভয়াবহ পরিবেশকে নতুন করে তুলে ধরেছেন এই নাটকে। কংগ্রেসের অত্যাচারের স্মৃতি জাগিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও ঘৃণা উস্কে দিতে চেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকারের সন্ত্রাস তথা সত্তর দশকের রাজনীতির বিভীষিকার ছবি আলোচ্য নাটকে তুলে ধরেছেন। এই ৭০ দশকের কংগ্রেস সরকারের অত্যাচার ও তাদের অপকীর্তিকে নিয়ে এর আগে তিনি 'ব্যারিকেড', 'দুঃস্বপ্নের নগরী', 'কালো হাত' প্রভৃতি নাটক রচনা করেছিলেন। কুড়ি বাইশ বছর পরেও সে বিভীষিকার চিত্র তিনি ভুলতে পারেননি। তিনি প্রয়োজন অনুভব করেছেন কংগ্রেসের অত্যাচার ও অপশাসনকে পুনরায় জনগণের সামনে তুলে ধরার দরকার। এই প্রজন্মের অনেকেই সেই বীভৎস অত্যাচার ও পুলিশি নির্যাতন প্রভৃতির খবর জানেন, তাদের কাছে ফিরিয়ে এনেছেন সেই বীভৎসতার ছবি, সেই সব স্মৃতি।

উৎস নির্দেশ :

১. উৎপল দত্ত, 'শিকড়', 'জপেনদা জপেন যা', উৎপল দত্ত, গদ্য সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ ১৮৫

২. সুকান্ত ভট্টাচার্য-'রবীন্দ্রনাথের প্রতি', 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থ, সারস্বত প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২০৬ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা-০৬, পুনঃমুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২ বঙ্গাব্দ, পৃ.-১৫

৩. দর্শন চৌধুরী, থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত, পুস্তক বিপনী, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ ১০ই অক্টোবর (মহালয়), ২০০৭, প.- ৩০৬

৪. উৎপল দত্ত, 'জবাবদিহি', উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৪, পৃ ৬৬

৫. উৎপল দত্ত, 'লিট্‌ল থিয়েটার ও আমি', উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, নৃপেন্দ্র সাহা (সম্পা), উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, ৭ নভেম্বর ২০০৫, পৃ ৪৫৬

৬. তদেব, পৃ ৪৫৯

৭. তদেব, পৃ ৪৬০

৮. সাক্ষাৎকার : সুরজিৎ ঘোষ, দেশ, ৩০ মার্চ ১৯৯১।

৯. শঙ্কর শীল : পিপল্‌স লিটল থিয়েটার, উৎপল দত্ত : মনন ও সৃজন, প্রতিভাস, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ ৮৬

১০. তদেব, পৃ ৮৮

১১. তদেব, পৃ ৯৪

১২. সূত্র-১, পৃ ১৮২

১৩. নাটক পরিচিতি, উৎপল দত্ত, নাটক সমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ভাদ্র ১৪৫০, পৃ ৬৬০

১৪. সূত্র-৩, পৃ ৪৪৩

১৫. উৎপল দত্ত : শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, 'শূদ্রক', শরৎ, ১৪০০, পৃ ১২৫

১৬. তদেব, পৃ ১২৫

১৭. সূত্র-৩, পৃ ৪৬২

১৮. উৎপল দত্ত : 'রাজনৈতিক নাটক, একটি কলহ', 'জপেনদা জপেন যা', উৎপল দত্ত গদ্য সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), দে'জ পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ জুলাই ২০১৫, পৃ ২৩১

১৯. উৎপল দত্ত : 'ব্রেখ্‌ট্‌ ও মার্ক্‌স্‌বাদ', 'স্তানিস্‌লাভস্কি থেকে ব্রেখ্‌ট্‌', উৎপল দত্ত গদ্য সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), দে'জ পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ জুলাই ২০১৫, পৃ ২৮৫

২০. উৎপল দত্ত : 'আনন্দলোক', পত্রিকায় সাক্ষাৎকার, ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯, পৃ ৯

২১. সূত্র-১৬, পৃ ২৩২

২২. উৎপল দত্ত : 'সংগ্রামের একটি দিক', উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, সম্পা : নৃপেন্দ্র সাহা, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, ৭ নভেম্বর ২০০৫, পৃ ২১

২৩. উৎপল দত্ত, 'পর্বান্তর' পত্রিকায় সাক্ষাৎকার, 'এপিক থিয়েটার', মার্চ ১৯৯৫, পৃ ৭৬

২৪. শঙ্কর শীল, 'মিনার্ভা থিয়েটারের দিনগুলি', উৎপল দত্ত : মনন ও সৃজন, প্রতিভাস, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ ৫০

২৫. তদেব, পৃ ৫৫

২৬. সূত্র-৩, পৃ ৪৫৯

২৭. সূত্র-১৩, পৃ ১৩৪

২৮. সূত্র-৩, পৃ ৪৬১

২৯. সূত্র-৭, পৃ ৯২

৩০. উৎপল দত্ত, 'এপিক থিয়েটার', নভেম্বর ও ফেব্রুয়ারি, মার্চ সংখ্যা, ১৯৭৩, পৃ ৯৪

৩১. সূত্র-১৩, পৃ ১৪৫

৩২. সূত্র-৩, পৃ ৪৪৬

৩৩. তদেব, পৃ ৪৪৬

৩৪. তদেব, পৃ ৪৫৩

৩৫. তদেব, পৃ ৪৫৫

৩৬. তদেব, পৃ ৪৫৭

৩৭. তদেব, পৃ ৪৫৮

৩৮. সূত্র-১৬, পৃ ২৩১